Vol. 28 | No. 2 | 1985

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

কবিগান : অতীত ও বর্তমান

Volume	28
Issue	2
Year	1985
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	স্বরোচিষ সরকার
Published online	February 1, 1985
DOI	10.62328/sp.v28i2.8
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v28i2.8
Pages	184-240
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

কবিগান : অতীত ও বর্তমান

স্বরোচিষ সরকার

কবিগান বলতে সাধারণত দুই দল গায়কের মধ্যে সঙ্গীত প্রতিযোগিতা এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে এক ধরনের বিতর্ক-অনুষ্ঠানকে বোঝায়। কবি-গানকে কখনো কখনো "কবির লড়াই"-ও বলা হয়ে থাকে। এই গানের দলনেতা কবিয়াল বা কবিওয়ালা এবং দলের অপ্রধান সঙ্গীতসঙ্গীগণ "দোহার" নামে পরিচিত। এই বিতর্কে সঙ্গীতের মাধ্যমেই একজন কবিয়াল "প্রশ্ন" করেন এবং বিরুদ্ধ কবিয়ালকে আসরে দাঁড়িয়ে উপস্থিত মতো সঙ্গীত রচনা করে উক্ত প্রশ্নের জবাব দিতে হয়। এক ধরনের ছদ্ম-লড়াইয়ের আবহাওয়া সৃষ্টি করে উভয় দল পালাক্রমে এই গান পরিবেশন করেন।

ঠিক কখন কবিগান প্রচলিত হয়, তা বলা যায় না। তবে আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কবিগান খুব জনপ্রিয় হয়। বিশেষত কলকাতায় নবজাগরিত বিত্তবান ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর চিত্তবিনো-দনের মাধ্যম হিশেবে কবিগান একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তখন, যাত্রা, পাঁচালী, তরজা, আখড়াই, হাফ-আখড়াই ইত্যাদির তুলনায় কবিগানের মান যথেষ্ট উন্নত ছিলো। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে আধুনিক সাহিত্যের প্রভাবে পাঁচালী ইত্যাদির মতো কবি-গানেরও জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় এবং কলকাতা থেকে ধীরে ধীরে নির্বাসিত হতে থাকে। উনিশ শতকের শেষ দশক নাগাদ কলকাতায় কবিগান প্রায় লোপ পায়।[১]

কলকাতা নগরী থেকে নির্বাসিত হওয়ার পর কবিগান পল্লীবাংলায় আশ্রয় নেয়। বঙ্গদেশের বিভিন্ন পল্লী-অঞ্চলে এখনো এ গানের প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত 'কবি' উপন্যাসে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বীরভূম অঞ্চলে প্রচলিত কবিগানকে কাহিনীর পটভূমি হিশেবে ব্যবহার

করেন।[২] প্রফুল্লচন্দ্র পাল শতাব্দীর প্রথম দিকের ঢাকার কবিয়াল হরিচরণ আচার্যের উল্লেখ করেছেন।[৩] চট্টগ্রামের রমেশ শীলও বর্তমান শতকের একজন উল্লেখযোগ্য কবিয়াল।[৪] খুলনা-বরিশাল-যশোর-ফরিদপুরের গ্রামাঞ্চলে এই কবি গানের জনপ্রিয়তা এখনো খুব কম নয়।

বর্তমানকালে প্রচলিত এই কবিগান আঠারো-উনিশ শতকের কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের কবিগানের একটি বিবর্তিত পরিণতি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের কলকাতার অন্যতম জনপ্রিয় কবিয়াল ভোলা ময়রা যে-সব স্থানে কবিগান পরিবেশন করেছিলেন, তার মধ্যে কলকাতা ছাড়া, ২৪ পরগণা, হুগলি, মেদিনীপুর, হাওড়া, বাঁকুড়া, ঢাকা, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, যশোর প্রভৃতি জেলার বিভিন্ন স্থানের নাম পাওয়া যায়।[৫] যেহেতু কবিগানে সব সময়ে কমপক্ষে দুটি দলের প্রয়োজন, তাই ভোলা ময়রার সঙ্গে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কবিয়ালগণও নিঃসন্দেহে উক্ত এলাকায় কবিগান পরিবেশন করেছিলেন। কলকাতার এই জনপ্রিয় কবিয়ালদের প্রভাবে ঐ সব অঞ্চলে কবিগানের যে শ্রোতৃমণ্ডলীর জন্ম হয়, তার ফলে সারা বাংলাদেশে এক সময়ে কবিগান একটি জনপ্রিয় বিনোদন মাধ্যম হিশেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বর্তমানে বাংলাদেশের বিভিন্ন পল্লী-অঞ্চলে কবিগানের উপাস্থিতিকে তাই উক্ত কবিগানের একটি সাম্প্রতিক ধারা হিশেবে চিহ্নিত করা চলে।

এ কথা সত্য যে, আঠারো-উনিশ শতকের কবিগানকে বর্তমান শতকে পৌঁছাতে বেশ কিছু আবর্তন-বিবর্তনের পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কলকাতা নগরীর বিত্তশালী নাগরিকদের পৃষ্ঠপোষণায় কবিগানের জনপ্রিয়তা তুঙ্গে উঠলেও, শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে শুরু করে এর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় এবং ক্রমে পল্লী-অঞ্চলে নির্বাসিত হতে থাকে। ভারত-বিভক্ত হওয়ার আগ-পর্যন্ত পূর্ববঙ্গের পল্লী-অঞ্চলে অনুকূল অবহাওয়ায় কবিগানের এক অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে। ভারত বিভক্ত হওয়ায়, পূর্ববঙ্গ পূর্ব-পাকিস্তানে পরিণত হয়। কবিগানের পৃষ্ঠপোষণায় অপেক্ষাকৃত সক্ষম বিত্তবান হিন্দুরা দেশ ত্যাগ করেন, অন্যদিকে কবিগানের বিষয়বস্তু প্রধানত হিন্দু-পুরাণ-ঘেঁষা হওয়ায় পূর্ব-পাকিস্তানে এর পসার কমতে শুরু করে। অধিকাংশ প্রতিভাবান কবিয়ালগণ পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও লক্ষণীয়, পূর্ব-পাকিস্তান থেকে কবিগানের প্রচলন কখনোই একেবারে

লোপ পায়নি। বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পরেও বাংলাদেশের পল্লী-অঞ্চলে, বিশেষত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে (খুলনা-বরিশাল-যশোর-ফরিদপুর ইত্যাদি জেলায়) প্রচলিত কবিগান গুণগত বা পরিমাণগত উভয় দিক দিয়েই উল্লেখ-যোগ্য। বর্তমান বাংলাদেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এই অঞ্চলে কবিগান যে অধিক প্রচলিত তার কারণ, এ অঞ্চলে হিন্দু জনসংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি। বস্তুত, আঠারো-উনিশ শতক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কবিগানের ইতিহাস বহু আবর্তন-বিবর্তনের ইতিহাস। উক্ত আবর্তন-বিবর্তন ধারার প্রতি লক্ষ্য রেখে অতীতকালের কবিগানের তুলনায় সাম্প্রতিক কালের কবিগান এবং তার বর্তমান অবস্থার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করা, আমার বর্তমান নিবন্ধের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এক : উদ্ভব ও বিকাশ

কবিগানের উদ্ভব সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতান্তর লক্ষ্য করা যায়। দীনেশচন্দ্র সেন মনে করেন, এই গান যাত্রা থেকে উদ্ভূত।[৬] সুশীলকুমার দে, কবিগানের পূর্বসুরি হিশেবে যাত্রার সঙ্গে পাঁচালীরও উল্লেখ করেন।[৭] কিন্তু কবিগানের আঙ্গিক, বিষয়বস্তু ইত্যাদি বিচার করে খেউড় এবং ঝুমুর গানকেই এর প্রকৃত উৎস বলে মনে হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব থেকে এক ধরনের আদিরসাত্মক প্রশ্নো-ত্তরমূলক গান ভাগীরথী তীরে নদীয়া শান্তিপুর অঞ্চলে প্রচলিত ছিলো। ক্রমে তা রাজধানী কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। উনিশ শতকের প্রারম্ভে এই খেউড় গান কিছুটা ওস্তাদি ঢঙে মণ্ডিত ও মার্জিত হয়ে আখড়াই গানে পরিণতি লাভ করে।[৮] কবিগানের অংশসমূহের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, আখড়াই গানের সঙ্গে এর বেশ কিছু অংশের সাদৃশ্য আছে। যেমন, উনিশ শতকে প্রচলিত কবিগান, মালসী, সখীসংবাদ, গোষ্ঠ, কবি ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত ছিলো।[৯] সমকালে প্রচলিত আখড়াই গানের ভবানীবিষয়ক (মালসীর সঙ্গে তুলনীয়) ; প্রণয়গীতি (সখীসংবাদের সঙ্গে তুলনীয়) ; প্রভাতী (গোষ্ঠ বা ভোর গানের সঙ্গে তুলনীয়) ইত্যাদি ভাগ কবিগানের আত্মীয়তাসূচক।[১০] আখড়াই গান ভেঙে নতুন পদ্ধতির যে হাফ-আখড়াই গানের সৃষ্টি হয় তা কবিগানের আরো নিকটবর্তী। সুকুমার সেনের বর্ণনানুযায়ী হাফ-আখড়াই

গানে—'একদল সখীসংবাদ গাহিয়া গেলে অপর দল আসিয়া প্রত্যুত্তরে সখীসংবাদ গাহিত। প্রতিপক্ষের গানে উত্তরের সঙ্গে যদি "চাপান" অর্থাৎ নূতন **challange** থাকিত তাহা হইলে প্রথম দশকে আবার আসিয়া দ্বিতীয় সখীসংবাদ গাহিতে হইত।'[১১] হাফ-আখড়াই-এর এ রীতি কবিগানের সঙ্গে অভিন্ন। প্রকৃতপক্ষে রীতিটি খেউড় থেকে সর্বত্র সংক্রামিত। এমন কি, "খেউড়" নামের একটি বিশিষ্ট অংশ উভয় গানের মধ্যে রক্ষিত। এ সমস্ত দিক বিচার করে খেউড়কে কবিগানের অন্যতম উৎস বলা যায়। খেউড়ের প্রাচীনত্বের প্রমাণ হিশেবে অনেকেই ভারতচন্দ্রের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিদ্বয় উদ্ধৃত করেন :

নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥[১২]

দামোদর মিশ্রের 'সংগীত দামোদর'-এ ধৃত ঝুমুরের সংজ্ঞার উল্লেখ এবং হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ঝুমুর গানকে কবিগানের সম্ভাব্য উৎস বলে দাবি করেন।[১৩] কবিগানের মতো ঝুমুর গানেও (১) সখীসংবাদ, (২) আগম (মালসী বা ভবানী বিষয়ের মতো), (৩) লহর, (৪) খেউড় ইত্যাদি ভাগ প্রচলিত।[১৪] ঝুমুরের সঙ্গে এই বংশগত সম্পর্ক এবং খেউড়ের প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে খেউড় এবং ঝুমুরকে কবিগানের প্রধান উৎস মনে করা যায়। যাত্রা ও পাঁচালীকেও হয়তো উপেক্ষা করা যায় না। বস্তুত, আধুনিক যুগের অব্যবহিত পূর্বে খেউড়, যাত্রা, পাঁচালী, তরজা, ঝুমুর ইত্যাদি যে-সব গান প্রচলিত ছিলো, এদের মধ্যে যে বিষয়ে সর্বাধিক মিল লক্ষ্য করা যায়, সে হচ্ছে এক দলের প্রতি অন্য দলের একটি প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা। আঠারো শতকের শেষ এবং উনিশ শতকের প্রথম দিকে এই দ্বন্দ্বমূলক গীতিধারা তৎকালীন বাংলাদেশের জনসাধারণকে বিনোদিত করে। শ্রোতৃমণ্ডলীর উক্ত মানসিকতায় লালিত হয়ে একটি চরম দ্বন্দ্বমূলক গীতিধারা হিশেবে কবিগানের আবির্ভাব।

উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চেষ্টায় গড়ে ওঠা ভারতের নতুন রাজধানী কলকাতায় কবিগান পরিপূর্ণরূপে বিকাশ লাভ করে।

অপেক্ষাকৃত বিত্তবান জমিদার শ্রেণী এর পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় কবিগান করা একটি লাভজনক পেশা হয়ে ওঠে। এ প্রসঙ্গে ব্রজসুন্দর সান্যালের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> ...(এই সময়ে) অনেকে এই ব্যবসায়ে প্রভূত অর্থ ও যশ অর্জন করিতেন এবং কলিকাতাতেই তাহাদের (কবিয়ালদের) প্রধান আড্ডা ছিল। বহুতর স্থান হইতে তাহাদের নিকট বায়না উপস্থিত হইত। কাজেই অর্থ ও যশের কুহকে পড়িয়া অনেকেই এই ব্যবসা অবলম্বন করিতেন।[১৫]

এই অনুকূল পরিবেশে বহু প্রতিভাবান ব্যক্তিও কবিয়ালের পেশা গ্রহণ করেন। কবিগানের ইতিহাসে এই যুগ সর্বাধিক গৌরবের যুগ। সাহিত্যিক মূল্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেও এর একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে।

গোজলা গুঁইকে কবিগানের আদি কবিয়াল বলা হয়। তাঁর সময়সীমা নিয়ে মতভেদ থাকলেও গোজলা গুঁইয়ের অনুসারী রাসু নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ বৈরাগী, রাম বসু, ভোলা ময়রা, ঠাকুর দাস সিংহ, এন্টনি ফিরিঙ্গি প্রমুখ উনিশ শতকের প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন।[১৬] এঁদের রচিত গানের সাহিত্যিক মূল্যের কথা বিবেচনা ক'রে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর 'সম্বাদ প্রভাকর'-এ বহু কবিগান সংগ্রহ ক'রে মুদ্রিত করেন।

দুই : বাংলাদেশে কবিগানের বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশনের প্রচলিত রীতি

কবিগান আলোচনা প্রসঙ্গে অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "কলকাতায় নব্যতন্ত্রের প্রসারে ক্রমে ক্রমে ঐ সমস্ত 'গোধূলির পতঙ্গ' নিঃশেষে মিলিয়ে গেলেও গ্রাম বাংলায়, বিশেষতঃ বাংলার পূর্বাঞ্চলে দীর্ঘকাল তার অস্তিত্ব ছিল।"[১৭] বস্তুত, বিশ শতকের গোড়ার দিকে পূর্ববঙ্গে কবিগানের একটি উল্লেখযোগ্য বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই সময়ের একজন প্রখ্যাত কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকার[১৮] তাঁর একটি মালসী গানে পূর্ববঙ্গের অর্ধশতাধিক কবিয়ালের নাম উল্লেখ করেন।[১৯] এর মধ্যে যশোর, খুলনা, বরিশাল,

ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ ও ত্রিপুরার কবিয়ালদের নাম পাওয়া যায়। গানটি "ওড়াকান্দির হরিঠাকুর" ও নমঃশূদ্রদের মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশে রচিত হলেও এর মধ্যে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, ধোপা, পৌণ্ড্র-ক্ষত্রিয়, রাজবংশী, মালী, বেহারা প্রভৃতি জাতির কবিয়ালদের নাম আছে। এতো অধিক সংখ্যক কবিয়ালদের তালিকা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় যে, কবিগান তখন পূর্ববঙ্গের এই সব জেলায় খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলো। এমন কি, কবিগান করা তখন একটি লাভজনক পেশা হয়ে ওঠে—এ তথ্য সম্ভবত তাও প্রমাণ করে। পূর্ববঙ্গের এ কবিগান সম্বন্ধে সমকালীন শিক্ষিত সমাজও মোটামুটি অবহিত ছিলেন বলে মনে হয়। এ প্রসঙ্গে ১৯৩৭ সালের একটি তথ্যের উল্লেখ করা যায়। ঐ বছর পঁচিশে সেপ্টেম্বর কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আশুতোষ ভবনে অনুষ্ঠিত এক কবিগানের অনুষ্ঠানে রাজেন্দ্রনাথ ও বিজয় সরকার[২০] কবিগান পরিবেশন করেন। উক্ত সভায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মৈত্র, ইন্দুভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায়, ধীরেন্দ্রনাথ সেন, সুকুমার সেন প্রমুখ পণ্ডিত উপস্থিত ছিলেন এবং এঁদের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি প্রশংসা-পত্র রাজেন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়। প্রশংসা-পত্রে বলা হয় : "··· কবিগান বাংলাদেশের সংস্কৃতির এক মনোহর এবং বিশিষ্ট প্রকাশ। এই কবিগানে শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সরকার ও তাঁহার প্রতিপক্ষ উভয়েই প্রশংসনীয় কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। আমরা শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথের কবিত্ব-শক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান, বাগ্মিতা এবং সংগীত শক্তি দেখিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিয়াছি। তাঁর মত সুযোগ্য কবিগায়ক দেশের সর্বত্র সমাদৃত হউক, ইহাই আমাদের আন্তরিক কামনা। দেশের সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য কবিগানের প্রচলন হওয়া এবং যুবকগণের মনে কবিগান সম্বন্ধে উৎসাহ, প্রীতি সঞ্জীবিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক বলিয়া মনে করি। ইতি—১৫ই আশ্বিন ১৩৪৪ (১লা অক্টোবর ১৯৩৭)।"[২১]

আমার আলোচনায় বর্তমানকালের কবিয়ালদের আদর্শ হিশেবে যাঁদের গ্রহণ করা হয়েছে উক্ত রাজেন্দ্রনাথ এবং বিজয় সরকার তাঁদের মধ্যে প্রধান। এ সময়ে প্রচলিত কবিগান উনিশ শতকের কবিগানের তুলনায় নিম্নশ্রেণীর ছিলো না, 'কাব্যমূল্য ও উৎকর্ষ' বিচার প্রসঙ্গে এ আলোচনার পরবর্তী পর্যায়ে তা দেখানো হয়েছে।

বর্তমানকালে বাংলাদেশে কবিগানের যে রীতি প্রচলিত তা শতাব্দীর গোড়ার দিকের এই বিকশিত অবস্থারই অনুরূপ। এই সময়ে যাঁরা কবিগান করতেন তাঁদের মধ্যে অনেককেই অথবা তাঁদের শিষ্য-প্রশিষ্যদের এখনো কবিগান করতে দেখা যায়।

আঠারো উনিশ শতকে কবিগানের যে আঙ্গিক প্রচলিত ছিলো, এ সময়ে তার খুব একটা পরিবর্তন হয়নি। তখন কবিগানের যেসব অংশের অধিক গুরুত্ব এবং জনপ্রিয়তা ছিলো সময়ের ব্যবধানে তার কিছুটা হ্রাসবৃদ্ধি হয়তো ঘটেছে। ধনিকশ্রেণীর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত হয়ে এ সময়ে কবিগানের সঙ্গীতসমৃদ্ধ অংশের গুরুত্ব কিছু হ্রাস পায়। অন্যদিকে "আলোচনা" নামক একটি বিতর্ক-সমৃদ্ধ অংশের সংযোজন ঘটায় কবিগান বর্তমানে অপেক্ষাকৃত ভিন্নরসের জোগান দিতে সমর্থ।

বর্তমানে প্রধানত কালীপূজা উপলক্ষে কবিগান পরিবেশিত হয়। কোথাও কোথাও দুর্গাপূজা বা অন্য কোনো পূজা-উৎসব উপলক্ষেও কবিগান পরিবেশিত হয়ে থাকে। কখনো কখনো শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় "কবিগান প্যান্ডেল" আয়োজনের কথাও শোনা যায়। কবিগায়কেরা তাঁদের গানের আঙ্গিক ক্ষেত্রবিশেষে কিছুটা পরিবর্তিত করে থাকবেন, তা অতি স্বাভাবিক। অনেক সময়ে বিভিন্ন রকম শ্রোতাদের অনুরোধে কবিয়ালগণ কবিগানের কোনো অংশের বৃদ্ধি অথবা কোনো অংশের হ্রাস ঘটিয়ে থাকেন।

কবিগান প্রধানত হিন্দুধর্মীয় বিষয় নিয়ে রচিত এবং গীত হলেও কবিগানের আসরে হিন্দুদের সঙ্গে বহু মুসলমান শ্রোতা কবিগানের রস উপলব্ধিতে শরিক হন। অপেক্ষাকৃত চতুর কবিয়ালগণ মুসলমান শ্রোতাদের মনোরঞ্জনার্থে মুসলিম ইতিহাস বা ইসলাম-ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ের উপস্থাপন করে থাকেন। তবে এটি প্রধানত "আলোচনা" অংশেই বেশি ঘটে। বলা বাহুল্য, কবিগানের অন্যান্য অংশের বিষয়বস্তু সাধারণত পূর্বনির্ধারিত পথে অগ্রসর হয় বলে সে সব স্থানে বিষয়-সংযোজনের অবকাশ খুব কম। এইজন্যে কবিগানে মুসলমান শ্রোতাদের প্রত্যাশা আশানুরূপ সফল হয় না। এই অতৃপ্তির ফলেই বোধ হয়, কোনো অজ্ঞাত সময়ে, কবিগানের সঙ্গে তুলনীয়

মুসলিম-ইতিহাস-নির্ভর জারি-গানের জন্ম হয়েছিলো। ছোট-খাটো সংযোজন বা পরিমার্জন সত্ত্বেও কবিগানের ক্রম সাধারণত নিম্নলিখিত বর্ণনার অনুসারী :

ডাক ও মালসী : "ডাক" ও "মালসী" উভয়ই শাক্ত গান। ডাক গান গাওয়ার মধ্য দিয়ে কবিগান শুরু হয়। এই গানের বিষয়বস্তু হলো, আদ্যাশক্তি কালীকে আহ্বান করা। গানটি অপেক্ষাকৃত ছোটো। কালীকে আহ্বান করা বা ডাকা হয় বলেই সম্ভবত, এই গানকে "ডাক" গান বলা হয়। কোনো কোনো অঞ্চলে এই গানকে "আগমনী" গান বলে। ডাক বা আগমনী গান কবিয়ালদের পূর্বরচিত থাকে। বিভিন্ন আসরে একই গান পরিবেশিত হওয়ার জন্যে ডাকগানে দলের দোহারদেরও প্রায় সবারই ভালো অধিকার থাকে।

ডাক গানের পরেই মালসী গান পবিবেশিত হয়। মালসী-গান অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ। এই গানকে কখনো "ডাক-মালসী", কখনো "সপ্তমী", কখনো "ভবানী বিষয়", কখনো বা "ঠাকরুন বিষয়" ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কালী বা ভগবতীকে বন্দনা করাই মুখ্যত এ-গানের উদ্দেশ্য। এর পংক্তিবিন্যাস "সখীসংবাদ" বা "কবি"-র মতো। সখীসংবাদ বা কবি-র মতো মালসীতেও কবিয়াল নিজে গান করেন না। দোহারের পেছনে দাঁড়িয়ে তিনি শুধু পদগুলো বলে দেন এবং দোহারগণ তা খুব উচ্চ-স্বরে শ্রোতৃমণ্ডলীর কানে পৌঁছানোর চেষ্টা করেন। সম্প্রতি এই মালসী গান ভগবতী বা কালীর পরিবর্তে দেশ-মাতৃকাকে নিয়েও রচিত হচ্ছে।[২২]

সখীসংবাদ : পালাক্রমে দুই দলের ডাক ও মালসী পরিবেশনের পর সখীসংবাদ শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে সখীসংবাদ দিয়েই কবির লড়াইয়ের সূত্রপাত।

সখীসংবাদ গানের বিষয়বস্তু বৈষ্ণবীয়। রাধাকৃষ্ণ ও সখাসখীগণ এ গানের আলোচিত চরিত্র। নায়ক নায়িকার সুখ-দুঃখের সংবাদ এখানে বর্ণিত হয়। বৈষ্ণব সাহিত্যের ওপর নির্ভর করে কবিয়ালরা এগুলো রচনা করেন। সখীসংবাদ-এর কাহিনী কখনো কখনো কবিয়ালদের স্বকপোলকল্পিতও হয়ে থাকে।

কবিগানের যে রীতি সূচনা কাল থেকেই প্রচলিত, তাতে দেখা যায়, এক দল কোনো বিষয়ের গান গাওয়ার পরে ভিন্ন দলকে ঠিক একই বিষয়ের উত্তর-গান গাইতে হয়। উনিশ শতকে এই দুই দলের গানকে যথাক্রমে "চাপান" এবং "উতোর" বলা হতো।[২৩] বর্তমানে প্রথম দলের গানকে "প্রশ্ন" এবং দ্বিতীয় দলের গানকে "জবাব" বলা হয়। অঞ্চলভেদে "প্রশ্ন"-কে "বেড়" নামেও চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। "প্রশ্ন" বা "বেড়" সাধারণত পূর্বরচিত থাকে, কিন্তু "জবাব" সব সময়ে কবিয়ালকে আসরে দাঁড়িয়ে মৌখিকভাবে রচনা করতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি তা দোহারের কানে পৌঁছে দেন। দোহারের কাজ, তাতে সুরারোপ করে শ্রোতৃমণ্ডলীকে শোনানো। সখীসংবাদ গান যেহেতু রাধাকৃষ্ণ ও সখাসখীদের নিয়ে রচিত তাই প্রশ্ন-গানে যদি কৃষ্ণের আক্ষেপ, কৃষ্ণকর্তৃক প্রেম নিবেদন বা কৃষ্ণকর্তৃক অন্য কোনো কিছুর কথা থাকে, "জবাব"-এর কবিয়ালকে তখন রাধার ভাষ্যে তার প্রত্যুত্তর দিতে হয়।

সখীসংবাদের পর বসন্ত, বিরহ, ভোর, গোষ্ঠ ইত্যাদি নামাঙ্কিত গানও কখনো কখনো পরিবেশিত হয়। বসন্ত ও বিরহ-কে পুরোপুরি সখীসংবাদের গোষ্ঠীভুক্ত করা যায়। ভোর, গোষ্ঠ ইত্যাদি গানে কৃষ্ণ ও তাঁর সঙ্গীগণ এবং যশোদা চরিত্রের উল্লেখ থাকে। এগুলোও বৈষ্ণবীয় বিষয়ভিত্তিক সখীসংবাদেরই অংশ মনে করা চলে।

কবি: কবিগানের নামকরণের সঙ্গে এই "কবি" অংশের সংযোগ থাকা সম্ভব। সূচনাকাল থেকে এ অংশের গুরুত্ব কখনো কমেনি। উত্তর-প্রত্যুত্তরের মধ্য দিয়ে কবিয়ালদের যুক্তিতর্ক এবং কবিপ্রতিভার বিচারে এই "কবি"-অংশের গুরুত্ব কম নয়। কবিগানের আঙ্গিক-কৌশল ও সুরসংক্রান্ত নিয়ম-কানুনের জন্যে কবিগান অপেক্ষাকৃত জটিল। এই জটিল নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যেও অনেক "কবি"গান যথেষ্ট সুন্দর এবং সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন হতে দেখা যায়। পূর্বরচিত "প্রশ্ন"তো বটেই, তাৎক্ষণিক রচিত "জবাব"-এর বেলায়ও একথা প্রযোজ্য। সুর ও ছন্দের গণ্ডীতে আবদ্ধ কবিগানের এ বিতর্ক অনেক সময়ে বেশ উপভোগ্যও হয়।

পূর্বে কবিগানের এ অংশ খেউড় নামে পরিচিত ছিলো। উনিশ শতকে প্রচলিত "কবির টপ্পা" বা "কবির লহর" এই "কবি"র পরিশিষ্ট হিশেবে

ব্যবহৃত হতো। কবিগানের বিরুদ্ধে যে অশ্লীলতার অভিযোগ আনা হয়, তার জন্যে এই অংশই মূলত দায়ী। দুই বা দেড় শতাব্দী পূর্বের "কবি" কতোখানি অশ্লীল ছিলো জানা না গেলেও বর্তমানে অপেক্ষাকৃত মার্জিত রুচির কালেও সে অভিযোগ অনেকটা সত্য।

বিচিত্র এর বিষয়বস্তু। পৌরাণিক কাহিনী থেকে শুরু করে সমসাময়িক কালে সংঘটিত বিশেষ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করেও এ গান রচিত হয়। বর্তমানে কবিগানের আসরে যে সব "কবি" শ্রোতাদের কাছে অধিক জনপ্রিয়, তার মধ্যে হরি আচার্যের 'কাক ও কোকিলের কবি', 'কন্যার পুনর্বিবাহের কবি', 'রাই রাজার কবি'; কামিনী সরকারের 'রাধা পাগলের কবি'; রাজেন্দ্রনাথ সরকারের 'রমেন্দ্র রাজার কবি', 'বুড়া বাবুর মৃত্যুর কবি', 'সুখ-দুঃখের কবি'; বিজয় সরকারের 'আয়ান ঘোষের কবি,' 'মৌমাছি ও ভ্রমরের কবি,' 'কেশব ভূঁইয়ার কবি'; নকুল দত্তের 'জল ও কুম্ভের কবি'; অনাদি সরকারের 'বর্ষা ও বসন্তের কবি'; রসময় সরকারের 'লৌহ ও স্বর্ণের কবি'; দ্বিজবর সরকারের 'ভারতশিয়ালীর কবি'; স্বরূপ সরকারের 'নারী স্বাধীনতার কবি', 'শিক্ষিত ঘরজামাইয়ের কবি', 'প্রাইভেট টিউটরের কবি', 'বিপিন গোঁসাইর কবি'; নারায়ণ সরকারের 'বিয়ের যৌতুকের কবি' প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

উপরে যে গানগুলোর উল্লেখ করা হলো, সবগুলোই "প্রশ্ন" বা "চাপান" হিশেবে প্রথম কবিয়ালের পরিবেশনের জন্যে। এই সমস্ত "কবি"তে যে ধরনের বক্তব্য আছে এবং দ্বিতীয় কবিয়াল এর যে "জবাব" গাইবেন, তা হবে সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী। আমার নিবন্ধের শেষ দিকে যে নমুনা আছে, একটি "কবি"-র জবাব কেমন হয়, সেখানে তা উদ্ধৃত করে দেখানো হয়েছে।

আলোচনা ও ধুয়া: কবিগানের "আলোচনা" অংশ "কবির টপ্পা" বা "পাঁচালী" নামেও পরিচিত। অপেক্ষাকৃত পরবর্তীকালের সংযোজন বলে আঠারো-উনিশ শতকের কবিগানে "আলোচনা" অংশ ছিলো না। তবে তখনকার হাস্য-রসাত্মক ও ব্যক্তিগত প্রসঙ্গজড়িত "কবির লহর"[২৪] নামক "কবি"-র এক অংশের সঙ্গে "আলোচনা"-র কিছুটা মিল আছে। বর্তমানে কবিগানের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ এই "আলোচনা"। "তরজার" সঙ্গে এর কিছুটা

মিল থাকলেও "আলোচনা"-র প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি "তরজা" থেকে যথেষ্ট উন্নতমানের। "আলোচনা"-র শুরুতে প্রথম কবিয়াল দোহারসহ আসরে দাঁড়িয়ে পৌরাণিক কাহিনী বা অন্য কোনো উৎস থেকে চরিত্র সন্ধান করে নিজেকে এবং অন্যজনকে উক্ত চরিত্রের ভূমিকায় অবতীর্ণ করান। যেহেতু দুইজন কবিয়াল, তাই এ ক্ষেত্রে দুটি চরিত্রের প্রয়োজন। সধারণত, গুরু-শিষ্য, ভিন্ন মতাবলম্বী দুই সম্প্রদায়ের নেতা অথবা যে সমস্ত ক্ষেত্রে মতান্তরের অবকাশ খুব বেশি, তেমনি দুটি চরিত্রকে গ্রহণ করা হয়। "প্রশ্ন" পক্ষের কবিয়াল দোহারদের মাধ্যমে সুর সংযোগে প্রশ্ন করে অবশেষে একাই আসরে দাঁড়িয়ে ছড়ার ছন্দে (প্রধানত ত্রিপদী ও পয়ার ছন্দোবদ্ধ) প্রশ্নগুলোর ব্যাখ্যা করতে শুরু করেন। "প্রশ্ন" করা হয়ে গেলে অন্য কবিয়াল "জবাব" দিতে আসেন। তিনিও কিছুক্ষণ দোহারসহ নিজের ছদ্ম-পরিচয় জানিয়ে দিয়ে একাই ছড়ার ছন্দে প্রশ্নের জবাব করতে শুরু করেন। "জবাব"-এর পর প্রথম কবিয়াল পুনরায় আসরে আসেন এবং একই বিষয়ে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলতে থাকে। এভাবে দুইতিন আসর চলে। এক একজন কবিয়াল এক আসরে তিরিশ মিনিট থেকে শুরু করে দুই-তিন ঘণ্টা পর্যন্ত সময় নেন। কবিয়ালদ্বয়ের এ কাব্যযুদ্ধ বহুক্ষণ স্থায়ী হয়, তাই, বলাই বাহুল্য, বহু অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ও এখানে স্থান লাভ করে। বিশেষত, যুক্তি সমর্থনে তাঁরা পৌরাণিক বা প্রচলিত আকর্ষণীয় কোনো কোনো গল্প বেশ সরস করে এবং ছন্দোবদ্ধভাবে বর্ণনা করেন। তাঁদের বক্তব্যের সমর্থনে এবং অন্য কবিয়াল বা তাঁর যুক্তিকে আক্রমণ করতে এক ধরনের চুটকি গল্প তাঁরা নিজেরাই সৃষ্টি করেন এবং "আলোচনা"-য় তা ব্যবহার করেন। এই সমস্ত গল্প শ্রোতাদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। কবিয়ালদের সৃষ্ট এবং ব্যবহৃত, এই সব গল্প গ্রামাঞ্চলে বহুল প্রচলিত। এর মধ্যে বেশ কিছু গল্প উন্নতমানের হলেও, কিছু গল্পের রুচি খুব একটা মার্জিত নয়।

ছড়ার ছন্দের এই "আলোচনা"-য় সব সময়ে একটি লঘু সুরের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সুরটি ধুয়াগানের। প্রশ্ন বা জবাবের প্রারম্ভে কবিয়াল "ধুয়া"-নামাঙ্কিত এ রকম একটি গান দিয়ে "আলোচনা" শুরু করেন। ঐ সুরে কিছুক্ষণ কাব্যযুদ্ধের পরে ভিন্ন সুরে ধুয়া গেয়ে নেওয়ার রীতি প্রচলিত আছে। ধুয়াগান "আলোচনা"-র প্রাণ। "আলোচনা"-য় ধুয়াগান প্রাসঙ্গিক

না হলেও চলে, তবে সাধারণত প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ধুয়াই কবিয়ালরা পরিবেশন করেন। এ গানগুলোর বৈচিত্র্য প্রচুর। আধ্যাত্মিক বিষয় থেকে শুরু করে মানব-জীবনের অতি সাধারণ সুখ-দুঃখের বিষয় নিয়েও এগুলো রচিত হয়ে থাকে। এ সমস্ত ধুয়ায় বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি গানের সুরের উপস্থিতি লক্ষণীয়।

পূর্বের কবিগানে শ্রোতারা খেউড় শোনার জন্যে যেমন আগ্রহ প্রকাশ করতেন,[২৫] বর্তমানে কবিগানের আসরে তেমনি ধুয়া গাওয়ার জন্যে কবিয়ালকে অনুরোধ জানানো হয়। কবিগানের এই অংশে দোহারদের কাজ অপেক্ষাকৃত কম। ধুয়াগানের বিশেষ কোনো পদ দোহারগণ মাঝে মাঝে সমস্বরে গেয়ে ওঠেন, যখন কবিয়ালের ছড়ার বিশেষ কোনো অন্ত্য-ধ্বনি উক্ত পদের শেষ ধ্বনির সঙ্গে মিল সৃষ্টি করে।

অপেক্ষাকৃত কম সুরপ্রধান "আলোচনা"-নামে কবিগানের এই বিতর্ক-অনুষ্ঠানকে আকর্ষণীয় করে তোলার প্রয়োজনে ধুয়াগানকে ব্যবহার করা হয়। কবে থেকে এর প্রচলন শুরু হয়েছে, তা জানা যায় না। তবে ভাটিয়ালী-সুর-প্রধান ধুয়াগান সর্বাধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে সর্বপ্রথম বিজয় সরকারের কণ্ঠে। বর্তমানে যাঁরা কবিগান করেন তাঁরা প্রায় সবাই-ই বিজয় সরকারের ধুয়াগান দ্বারা প্রভাবিত।

ধুয়াগান গীতিকবিতার মতো আবেগ প্রধান। অধিকাংশ গানের মধ্যে কবিহৃদয়ের ব্যাকুলতা প্রকাশিত। তবে কবিয়ালরা সরাসরি না বলে কখনো কখনো পৌরাণিক কোনো চরিত্রের মধ্য দিয়ে তাঁদের আবেগ প্রকাশ করে থাকেন। যেমন, বৈষ্ণব পদের মতো রাধার উক্তি দিয়ে অনেক গান রচিত হয়। কখনো কখনো ধুয়াগানকে বাউল গানের সঙ্গেও তুলনা করা যায়। আবার চারণ-কবিদের মতো সমসাময়িক বিষয় নিয়েও এঁরা এসব গান রচনা করেন। ধুয়া গানের জনপ্রিয়তা ও সাহিত্যিক মূল্য কবিগানের অন্যান্য অংশের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করে "নমুনা" অংশে বেশ কয়েকজন কবিয়ালের অনেকগুলো ধুয়াগান উদ্ধৃত করা হলো।

জোটের পাল্লা : বর্তমান কালের কবিগানে "আলোচনা"-ই মূল অংশ। "আলোচনা" শেষ হলে কবিগান সমাপ্তির আর বাকি থাকে না। তা হলেও

সবশেষে ''জোটের পালা''-নামক ছোটো একটি সমাপ্তি-নির্দেশক অংশ কবিগানের শেষে গাওয়া হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এই অংশে কবিয়ালদের ছড়া-কাটার লয় খুব দ্রুত হয়। এটি অনেকটা মিলনাত্মক, তাই হাস্যরসই এখানে মুখ্যস্থান লাভ করে।

এতে একটি পালা আছে। একজনকে এখানে কৃষ্ণ এবং অন্য জনকে বলরাম সাজতে হয়। হাস্যরসাত্মক, বিদ্রুপ আদি রসাত্মক স্বল্পস্থায়ী একটি দ্বন্দ্বের অবসানে এঁরা একে অপরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করেন। এইভাবে কবি-গান সমাপ্ত হয়।

তিন : পরিবর্তন---অতীত থেকে বর্তমান

উনিশ শতকের কবিগানের আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক বলেন, ''এ গান একই সঙ্গে গ্রাম্য গান, আবার নাগরিক শিল্প : লোকগীতির অন্তর্ভুক্ত, আবার ভব্যসাহিত্যেরও আত্মীয় ; গীতাত্মক আবার কবিতাত্মক ; দেবদেবীর লীলারসে পূর্ণ, আবার বাস্তব জীবনের সঙ্গরসে উতরোল : কখনও বিশুদ্ধ ভক্তির গান, কখনও মানবীয় প্রীতিরসে পূর্ণ : কখনও সুস্নিগ্ধ মহত্ত্ব-ব্যঞ্জক, কখনও অতি জঘন্য ইতরতায় পর্যবসিত।''[২৬] উনিশ শতকের কবিগানের উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো বর্তমান শতকের কবিগানের বেলায়ও সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু শতাব্দীর ব্যবধানে সমাজে যে পরিবর্তন হয়েছে, বিশেষত, কবিয়াল ও শ্রোতাদের মূল্যবোধের যে রূপান্তর ঘটেছে, তার ফলে কবি-গানের আঙ্গিকে, বিষয়বস্তুতে এবং কবিয়ালদের জীবনে যে লক্ষণীয় পরি-বর্তন দেখা যায়, তা মোটামুটি নিম্নরূপ :

কবিয়ালদের পরিবর্তন : উনিশ শতকের প্রতিষ্ঠিত কবিয়ালদের অধিকাং-শেরই বাসস্থান ছিলো কলকাতা বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে। যেমন, রাসু নৃসিংহের জন্ম ফরাসডাঙ্গার নিকটবর্তী গোন্দলপাড়া, হরু ঠাকুরের কলকাতার সিমুলিয়া, নিত্যানন্দ বৈরাগীর চন্দননগর, রাম বসুর কলকাতার নিকটবর্তী শালিখা গ্রাম, ভোলা ময়রার কলকাতার নিকটবর্তী গুপ্তীপাড়া (বাসস্থান কলকাতার বাগবাজার), এন্টনি ফিরিঙ্গির কলকাতার মির্জাপুর।[২৭] অন্যদিকে বর্তমান কালের কবিয়ালদের সবার জন্মই প্রত্যন্ত পল্লীতে। বড়ো কোনো

শহরের কাছাকাছি তো নয়ই, এমন কি, মহকুমা শহর থেকেও দূরে। যেমন, হরি আচার্যের নরসিংদীর কোনো গ্রাম, রমেশ শীলের 'কক্সবাজার যাবার পথে কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণ তীর।'[২৮] রাজেন্দ্রনাথ, বিজয়, নিশি, নকুল দত্ত সবার বেলায়ই একথা প্রযোজ্য। যুগের ব্যবধানে কবিয়ালদের জন্মস্থানের এই পরিবর্তনের সঙ্গে, কবিগানের রুচি এবং বিষয়বস্তু পরিবর্তনের সঙ্গতি থাকতে পারে। তৎকালীন কলকাতা নগর হলেও অধিকাংশ নগরবাসীদের রুচি ও মূল্যবোধ গ্রাম্য ছিলো। কবিয়ালদের বেলায়ও তাই দেখা যায়। অন্যদিকে বর্তমান কালের বাংলাদেশে শহর ও পল্লীর প্রচুর ব্যবধান সত্ত্বেও, প্রত্যন্ত পল্লীর কবিয়াল পর্যন্ত অনেকক্ষেত্রে আধুনিক রুচি ও মূল্যবোধের পরিচয় দেন। শিক্ষার প্রসার, প্রচার মাধ্যম ও আধুনিক বিনোদন মাধ্যম-সমূহের ক্রমান্বয়ে বিস্তৃতি হয়তো এর জন্যে দায়ী। এর ফলে কবিগান ও কবিয়ালদের কিছু বাহ্যিক পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। যেমন, অতীতের কবিগানে তেরো-চৌদ্দজন কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত লাল কাপড়ে ঢেকে, অনাবৃত দেহে, নূপুর পায়ে, পাখির পালকযুক্ত তেকোণা টুপি পরে আসরে নামতেন।[২৯] বর্তমানে পোশাকের এই অমার্জিত গ্রাম্য অবস্থা লোপ পেয়েছে।[৩০] বাদ্যযন্ত্র ব্যবহারেও কিছুটা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে কবিগানে কিছু কিছু বাদ্যযন্ত্র দেখা যায়, যা অতীতে ব্যবহৃত হতো না।

অবশ্য কবিয়ালদের শিক্ষাগত যোগ্যতার তেমন কোনো পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয় না। শিক্ষার ব্যাপক প্রসার সত্ত্বেও অধিকাংশ কবিয়ালদের আধুনিক শিক্ষাবিমুখ হতে দেখা যায়। বর্তমানে যাঁরা কবিগান পরিবেশন করেন বা শতাব্দীর গোড়ার দিকেও যাঁরা জীবিত ছিলেন এঁদের মধ্যে কেউ (অতি সাম্প্রতিক কালের দু'একজন বাদে) তেমন কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত নন। বস্তুত, কেউই মাধ্যমিক পরীক্ষাও উত্তীর্ণ নন।[৩১]

উনিশ শতকের কবিয়ালদের মধ্যে কেউ কেউ নিম্নবর্ণীয় হিন্দু থাকলেও অধিকাংশই উচ্চ-বর্ণ উদ্ভূত ছিলেন। বর্তমান শতকের কবিয়ালদের প্রায় সবাই-ই নিম্নবর্ণীয় হিন্দু। বর্তমানে নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের এতো অধিক পরিমাণে কবিয়ালের পেশা গ্রহণ করার পেছনে কিছু কারণ অনুমান করা যায়। শিক্ষার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে রুচির পরিবর্তন ঘটে। নিম্নবর্ণীয় হিন্দুরা উচ্চ-বর্ণীয় হিন্দুদের তুলনায় আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ থেকে পশ্চাৎপদ থাকায় এদের

রুচির বিকাশ কিছুটা ব্যাহত হয়। অন্যদিকে এই ব্যাহত বিকাশই কবিগান এবং কবিয়াল-পেশা গ্রহণের পক্ষে অনুকূল ছিলো। অবশ্য নিম্ন-বর্ণীয় হিন্দুদের এ পশ্চাদপদতার জন্যে উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষণার অভাব ও আর্থিক দুরবস্থাকে দায়ী করা চলে। এই বিকাশহীনতাই সম্ভবত নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের এতো অধিক পরিমাণে কবিয়াল-পেশার মতো এমন একটি অনাধুনিক পেশা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে।

বর্তমানে নিম্নবর্ণীয় হিন্দু কবিয়ালদের চিহ্নিত করা খুব সহজ। এঁরা প্রায় সবাই-ই নিজ নিজ নামের শেষে পূর্বপুরুষদের পদবী ব্যবহার না করে তার পরিবর্তে "সরকার" পদবী ব্যবহার করেন। এর পেছনে কোনো হীনমন্যতা-বোধ কাজ করতে পারে। কেননা, নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের পদবী অনেক সময়ে শুনতে খুব খারাপ শোনাতো এবং নিম্নশ্রেণীর কোনো পেশা বা বৃত্তির পরিচয়বাহী ছিলো। বর্তমান বাংলাদেশে কবিয়ালদের যে "সরকার" বা "কবির সরকার" নামে চিহ্নিত করা হয়, এঁরা সম্ভবত সেখান থেকেই এ পদবী গ্রহণ করে থাকেন।

আঙ্গিকের পরিবর্তন কবিগানে মালসী, সখীসংবাদ, কবি-র পংক্তি-বিন্যাস একই রকমের। আঠারো-উনিশ শতকের কবিগানে এই পংক্তি-বিন্যাস—চিতান, পরচিতান, ফুকা, মেলতা, মহড়া, শাওয়ারি, খাদ, দ্বিতীয় ফুকা, দ্বিতীয় মেলতা, অন্তরা ইত্যাদিতে বিন্যস্ত ছিলো।[৩২] বর্তমান কালে বাংলাদেশে প্রচলিত কবিগানের পংক্তিবিন্যাস সাধারণত নিম্নলিখিত ক্রমের অনুসারী—ধরন, পাড়ন, ফুকার, মিশ, মুখ, প্যাঁচ, খোঁচ বা খোঁজ, দ্বিতীয় ফুকার, দ্বিতীয় মিশ, মুখ; অন্তরা: দ্বিতীয় ধরন, দ্বিতীয় পাড়ন, তৃতীয় ফুকার, শেষ মিশ ইত্যাদি।

আঠারো-উনিশ শতকে "কবির লহরে" যে ধরনের বিষয় আলোচিত হতো, বর্তমানে "আলোচনা" তার স্থান দখল করেছে। "কবির লহরে" ব্যক্তিগত আক্রমণাদি বর্তমানে "আলোচনা"-য় দেখা যায়। তাছাড়া বর্তমানে কবিগানের মধ্যে যে ধুয়াগান পরিবেশিত হয়, তা সম্পূর্ণ নতুন। অতীতকালে এর কোনো নিদর্শন পাওয়া যায় না। বর্তমানে ধুয়াগান এতো জনপ্রিয় যে, সাধারণে কবিগান বলতে সাধারণত এগুলোকেই বুঝে থাকে।

সূচনাকালের কবিগানে "কবির লহর" বা "খেউড়ে" জয়-পরাজয় নির্ধারিত হতো। কিন্তু বর্তমানকালের কবিগানে "জোটের পাল্লা" নামক ছোট একটি অংশে কবিয়ালদ্বয় ছোটো একটি পালার মতো করে একজন কৃষ্ণ ও অন্যজন বলরামের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং সামনাসামনি দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ বাক্‌যুদ্ধের পরে উভয় উভয়কে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলে গানের সমাপ্তি ঘটে।

বিষয়বস্তুর পরিবর্তন : আঠারো উনিশ শতকের কবিগানে হিন্দুধর্মের দুটি প্রধান সম্প্রদায় শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মই প্রায় সম্পূর্ণ দখল করে ছিলো। দুই শতাব্দী পরের বাংলাদেশে কবিগানের বিষয় এখন বিস্তৃততর। শাক্ত ও বৈষ্ণব-ধর্ম ছাড়া কবিগান এখন ইসলাম ধর্ম, খ্রীস্টান ধর্ম, হিন্দুধর্মের রামকৃষ্ণ আশ্রম, মতুয়া ধর্ম[৩৩] ইত্যাদি সম্প্রদায়কে আশ্রয় করেও রচিত এবং গীত হয়।

উনিশ শতকে কবিগানের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন নতুন বিত্তবান জমিদার শ্রেণী। তাঁদের রুচির স্থূলতার জন্যে কবিগানের বিষয় প্রায়ই অশ্লীলতর হতো। উনিশ শতকের প্রথম দিকে কলকাতা আধুনিক সভ্যতার সংস্পর্শ লাভ করতে শুরু করলেও, কবিগানের শ্রোতারা চিন্তাগত দিক দিয়ে ছিলেন পুরোপুরি মধ্যযুগীয়। প্রায় দু'শতাব্দী পরে বাংলাদেশের পল্লী যদিও এখনো মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণা থেকে বেরিয়ে আসেতে পারেনি, তবু অনেক ক্ষেত্রে জনসাধারণের বিশ্বাস ও রুচির যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। এই কারণে কবি-গানের কিছু অংশ ক্রমশ সংক্ষিপ্ত এবং কিছু অংশের সম্প্রসারণ ঘটেছে। যেমন, "কবির লহর" লুপ্ত হয়েছে, যুক্ত হয়েছে "আলোচনা ও ধুয়া"।

আঠারো-উনিশ শতকে যে কবিগান প্রচলিত ছিলো তার কবিয়ালগণ যুগ সম্বন্ধে খুব কমই সচেতন ছিলেন। প্রফুল্লচন্দ্র পাল তাঁর 'প্রাচীন কবি-ওয়ালার গান' গ্রন্থে যে অসংখ্য প্রাচীন কবিগান সংগ্রহ করেন, তার মধ্যে একটি গানেও কবিয়ালদের সমাজ সচেতনতার পরিচয় নেই। বিকৃত রুচির উদাহরণ সেখানে যত্রতত্র মেলে। প্রখ্যাত কবিয়াল রাম বসুর সখীসংবাদের কিছু অংশ :

এক৷ রেখে যুবতীকে গেল দেশান্তর।
তার বিরহেতে প্রাণ আমার দহে নিরন্তর॥

সে বিনে এ যৌবন রতন।
বল রক্ষক কে, করিবে রক্ষণ।
জানে না কমল কলি, ফুটিবে মাসান্তে।।[৩৪]

এখানে, বিশেষত, শেষপংক্তিতে আদি রসাত্মক যে অশ্লীল ইঙ্গিতের পরিচয় পাওয়া যায়, তা আধুনিক পাঠকের কাছে রীতিমতো পীড়াদায়ক। অথবা, কবিয়াল রামকমলের "কবির লহর" থেকে :

কুকুরে তুলসী ডালে, মুতে দু-ঠ্যাং তুলে,
তবু সে তুলসীর পত্র হলে দেবতা পূজা হয়।
তুমি পায়ের কাছে কুনো বেড়াল, ঘরে বাজারে গ্রামে,
যেমন মেগের কাছে পেগের বড়াই
তেমনি তোমার বড়াই দেখতে পাই।[৩৫]

এখানে দৃষ্টিভঙ্গি ও শব্দপ্রয়োগের গ্রাম্যতা সহজেই চোখে পড়ে। বস্তুত, অতীতের কবিগানের বিষয়বস্তু ঘুরেফিরে প্রায় সর্বত্রই এ রকম।

অন্যদিকে বর্তমানকালের কবিয়ালদের রচিত কবিগানে অপেক্ষাকৃত মার্জিত রুচি, বিষয়বস্তু ও শব্দপ্রয়োগে গ্রাম্যতা থেকে কিছুটা উত্তরণ, এমন কি, কোথাও কোথাও সমাজসচেতনতার পরিচয়ও লক্ষ্য করা যায়। যেমন, বর্তমানের কবিয়াল নারায়ণ সরকারের[৩৬] 'বিয়ের যৌতুকের কবি'তে সমাজের যৌতুক প্রথা কাব্যের বিষয়বস্তু হয়েছে। উক্ত কবির কাহিনী অংশ নিম্নরূপ : এক ভদ্রলোকের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ের একটি বিবাহের প্রস্তাব আসে। মেয়ে ছাড়া, বরপক্ষ আংটি, বোতাম, চশমা, ছড়ি, সাইকেল, ঘড়ি ইত্যাদি দাবি করে। কন্যা এতে খুব অপমানবোধ করে এবং বিয়ের আসরে এসে বরের সামনে জিনিসপত্রগুলো দিয়ে নিজে বিয়ে করতে অসম্মতি জানায়। গানটির সংলাপ এ রকম :

আমাকে কও দেখি তোমরা কি সমাজে হয়েছো ঠিক উন্নত।
তোমরা এম এ, বি এ পাশ করিয়ে গো
হলে আজ নারীর কাছে ঘৃণিত।।

ভুলে গিয়ে পুরাকালের মিলনের ছন্দ
করো টাকার সম্বন্ধ
তোমাদের গায়ে কহেনা মানুষের গন্ধ গো
বিক্রি হও গোরু আর ঘোড়ার মতো ।।

স্বরূপ সরকারের 'নারী-স্বাধীনতার কবি'-তে অনুরূপভাবে কোনো মহিলা তার অধিকার সচেতনতার পরিচয় দেয়।

বর্তমানকালের কবিয়ালদের কাছে আধুনিক যুগ অনেক সময়ে সমালোচিত হয়। এই মধ্যযুগ-প্রীতি বা এই ধরনের সচেতনতা অতীতে দেখা যেতো না। বর্তমানকালের কবিয়াল দ্বিজবর সরকার[৩৭] তাঁর 'ভারতশিল্পীর কবি'তে আধুনিক যুগকে 'কলিকাল' বলে অভিহিত করেন। মেয়েদের চাকরি করা সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য :

মেয়েরা সব চাকরি করে স্বামী রাঁধে ভাত
কপালপোড়া ভাবে আমার ফিরেছে বরাত
মরি হায় হায় রে।
ক্রমে দাম্পত্যে ঘটিলো ব্যাঘাত গো
মূলের চাকা উল্টো দিকে ফিরেছে
বাঘের গাল হরিণশাবক চাটতেছে ।।

লক্ষণীয়, বিষয়বস্তু এখানে নতুন, কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গি যথেষ্ট পুরোনো। উনিশ শতকের কবিগানের জন্য সঙ্গতিপূর্ণ এ রকম মানসিকতার পরিচয়, তখন না পাওয়া গেলেও এখন পাওয়া যাচ্ছে।

চার : কাব্যমূল্য ও উৎকর্ষ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কবিগানের বিরূপ সমালোচনা করেছেন। তাঁর মতে কবিগানের সাহিত্যিকমূল্য খুবই সামান্য। ভাষার বিশুদ্ধি ও নৈপুণ্য বিসর্জন, সুলভ অনুপ্রাস ও ঝুটা অলংকারের ব্যবহার, স্ত্রীপক্ষ ও পুরুষপক্ষের পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও তীব্র সরস পরিহাসমূলক বিষয়বস্তু, বৈষ্ণব সাহিত্যের উৎকৃষ্ট ভাবের কলঙ্ক ও ছলনায় পরিণতি—ইত্যাদি দোষ লক্ষ্য করে

তিনি কবিগানকে ক্ষণকালের সাহিত্য হিসেবে বর্ণনা করেন।[৩৮] রাজসভার পরিবর্তে 'সর্বসাধারণ নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি' পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় এই গানের এই অবস্থা বলে তাঁর অভিমত। তা সত্ত্বেও, রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত স্থানে স্থানে এর সৌন্দর্য এবং ভাবের উচ্চতা স্বীকার না করে পারেননি।

কবিগানের সাহিত্যিকমূল্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য অনেকে মেনে নিতে রাজি নন। তাঁদের মতে, রবীন্দ্রনাথ এ ক্ষেত্রে অনেকটা অবিচার করেছেন।[৩৯] প্রাচীন-মধ্য যুগের বাংলাসাহিত্যেও যে গীতি-প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়, কবিগানেও তা পুরোপুরি রক্ষিত। এমন কি, আধুনিক গীতিকবিতার "অন্তর্মুখী ভাবচেতনা" কবিগান থেকেই সংক্রামিত বলে তাঁদের ধারণা। তাঁরা দাবি করেন যে, মাইকেল মধুসূদনের কাব্যেও (প্রধানত ব্রজাঙ্গনা কাব্যে) কবিওয়ালাদের প্রভাব স্থায়ীভাবে মুদ্রিত।[৪০]

মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের সন্ধিস্থলের এই গানের সাহিত্যিকমূল্য সম্পর্কে এ বিতর্ক বর্তমানে বাংলাদেশের পল্লী-অঞ্চলে প্রচলিত কবিগানের বেলায়ও প্রযোজ্য। এ কথা সত্য যে, সাম্প্রতিক বাংলাদেশ উনিশ শতকের বাংলা থেকে আমূল পরিবর্তিত। মাত্র এক শতাব্দীর ব্যবধানে সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার উৎকর্ষ অকল্পনীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কবিগানের সঙ্গে এখন তার ক্ষীণ যোগাযোগের প্রশ্ন ওঠে না। তবু পল্লী-অঞ্চলের প্রচলিত এই সব গানের সাহিত্যিক-মূল্য একেবারে উপক্ষেণীয় নয়। অন্তত, অতীতকালের কবিগানের তুলনায় বর্তমান কবিগান যথেষ্ট উন্নত, তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

কবিগান বিচারের সবচেয়ে বেশি অসুবিধা এর উপাদানের অভাব। এ অভাব উনিশ শতকের কবিগানের বেলায় যেমন ছিলো, বর্তমানের কবিগানের বেলায়ও তেমনি। "প্রশ্ন"-সমূহ পূর্ব-রচিত থাকলেও সমস্ত "জবাব"ই আসরে দাঁড়িয়ে রচনা করতে হয়, তাই জবাব-সমূহের লিখিত রূপ পাওয়া সম্ভব নয়। উনিশ শতকের কবিগানের যাঁরা কাব্যমূল্য বিচার করেছেন, তাঁদের সকলকেই প্রশ্নসমূহের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। আমার আলোচনায় সম্প্রতি "ধুয়া" নামক বিশেষ যে অংশ কবিগানে অধিক জনপ্রিয়, তাকেও ব্যবহার করেছি। এগুলো কবিয়ালদের প্রায়ই পূর্বরচিত থাকে।

যে কোন গান তার "সুর" এবং "কথা"-র সমন্বয়েই সম্পূর্ণ। ছন্দ-অলংকারের অনেক অপূর্ণতা সুরের মাধ্যমে পুষিয়ে নেওয়া যায়। গানের কাব্যমূল্য অনেক ক্ষেত্রে তাই অতিরিক্ত প্রাপ্তি। কবিগানের মধ্যে কখনো কখনো যে অকৃত্রিম আবেগ ও গীতিধর্মীতার পরিচয় পাওয়া যায়, তা যথার্থই প্রশংসার দাবি করতে পারে। সাম্প্রতিককালের ধুয়া গানকে তো রীতিমতো গীতিকবিতাই বলা যায়।

কবিগানের মালসী, সখীসংবাদ ও কবি-র পংক্তিবিন্যাস একই রকমের, ভেদ শুধু বিষয়বস্তুতে, সে কথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে। এসব গানের মধ্যে অনুপ্রাসের মাত্রাতিরিক্ততা বিষয়ে যে অভিযোগ আছে,[৪১] তা অনেকটা সত্য। কিন্তু কখনো কখনো কবিগানের অনুপ্রাস-ব্যবহার এবং শব্দ-প্রয়োগের নিপুণতা যথেষ্ট উন্নতমানের হয়। যেমন, কালীকে বন্দনাচ্ছলে বর্তমান শতকের কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথের মালসী গানের কিছু অংশ :

মণ্ডপ ঘর মোর আকাশখানি
তাতে প্রকৃতির বায়ু ব্যজনি
সূর্য প্রদীপ, চাঁদ ধূপতির ধূপ
দেখবো সূর্যালোকে তিনটি চোখে
মা তোমার ওই বিশ্বব্যাপী রূপ,
আসন শিবস্বরূপ লও হৃদিপদ্ম
ভক্তি অর্ঘ্য অশ্রু পাদ্য
দৈবী সম্পদ বিংশ পাদ নৈবেদ্য
প্রসাদ করে দাও তুমি নিয়ে ।।
মনটা করুক ঘণ্টাবাদ্য বীজ আদি মিশাইয়ে ।।
অসৎ চিত্তবৃত্তি পশুগুলি
তোমার দ্বারে দিব বলি
তর্পণ করবো জ্ঞান-যজ্ঞ আগুনে''ইত্যাদি।

এখানে কবিয়ালের অলংকার-প্রয়োগ নৈপুণ্য যে কোনো মধ্যযুগীয় কবির সঙ্গে তুলনার যোগ্য। আরাধ্যা দেবীকে বিশ্বব্যাপিনী মনে করা, আকাশকে মণ্ডপ, বায়ুকে ব্যজন, সূর্যকে প্রদীপ, চাঁদকে ধূপতির ধূপ, হৃদয়কে শিব স্বরূপ

এবং চিত্ত বৃত্তিগুলোকে পশু ইত্যাদি উপমায় চিহ্নিত করার মধ্যে উপমা-প্রয়োগে নৈপুণ্য এবং কবিয়ালের কবিপ্রতিভার পরিচয় বহন করে।

সখীসংবাদ গান যেহেতু বৈষ্ণবীয় বিষয় নিয়ে রচিত হয়, তাই এখানকার রাধাকে বৈষ্ণব পদের রাধার মতোই কবির ছদ্মভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। নিশিকান্ত সরকারের[৪২] সখীসংবাদে কৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপোক্তিতে রাধার নিম্নোদ্ধৃত কবিহৃদয়ের ছোঁয়া স্পষ্ট :

কেন তোমায় ভালোবাসি মন প্রাণ হলো উদাসী
ঘর ফেলে জঙ্গলে আসি দাসী হলেম রাঙা পায়ে।
বাঁশের বাঁশি কী গুণ জানে কী কথা কয় কানে কানে
কুলজা অকূলে আনে ফিরতে নারে কিনারায় ॥
দেখলে না যায় দেখার আশা
না দেখলেও জ্বালা
বন্ধু তোমার লীলাখেলা বুঝবে কী অবলাগণ ॥ ইত্যাদি।

কবিগানের "কবি" অংশে কখনো কখনো গল্পরসের সন্ধান মেলে। যেমন, কামিনী সরকারের[৪৩] 'রাধাপাগলের কবি'তে কবিয়াল যে বর্ণনা দেন, তা হলো : বরিশাল জেলার খেজুর তলা নামক গ্রামে রাধাপাগল নামের এক ব্যক্তি হিন্দুদের একটি ধর্মসম্প্রদায়ের নেতা এবং তিনি নিজেকে অবতার বলে প্রচার করেন। তাঁর সম্প্রদায়ে নারীপুরুষ একত্রে হরিনাম করে। স্বয়ং অবতার চারটি বিয়ে করেন—এসব কবিয়াল কামিনী সরকারের কাছে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হয়, তাই তিনি তার কারণ জানতে চান। অথবা স্বরূপেন্দু সরকারের[৪৪] 'শিক্ষিত ঘরজামাইয়ের কবি'তে যে কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে, তা প্রায় পূর্ণ একটি গল্পের মতো : একজন গরিব লোকের দুই ছেলে। বড়ো ছেলেটির শ্বশুরই তাকে অর্থ সাহায্য দিয়ে "বিএ-বিটি" পাশ করিয়েছে। এখন সে শ্বশুর বাড়িতেই থাকে। দরিদ্র মা-বাবা বা পরিবারের অন্যান্যের খোঁজ খবর নেওয়ার প্রয়োজন সে বোধ করে না। দিনমজুর বুড়ো বাবা একদিন ছেলের কাছে অর্থ সাহায্য চাইতে এলে, ছেলে তাকে উল্টো কতগুলো প্রশ্ন করে ; যার অর্থ হলো, যেহেতু তুমি তোমার দায়িত্ব পুরোপুরি পালন করতে পারোনি, সেহেতু আমার ওপর তোমার কোনো

দাবি থাকতে পারে না, ইত্যাদি। গল্পরস সমন্বিত এই সব "কবি"-র রচনায় বর্তমানে অনেকেই বেশ সিদ্ধহস্ত। বর্ণনা প্রায়ই সহজ, সরল এবং কাব্যধর্মী। উপর্যুক্ত 'শিক্ষিত ঘর জামাইয়ের কবি'-র কিছু পংক্তি উদাহরণ স্বরূপ উদ্ধৃত করা চলে :

ছেলের পিতা পরের বেগার খেটে
দিন আনে দিন খায়
একদিন আষাঢ় মাসের ঘন বর্ষায়
কাজ বেগার, উপবাসী দিবসভর
রজনীর অন্ধকারে, বুড়ো উপনীত ছেলের দ্বারে
আঁখি ঝরঝর॥ ইত্যাদি।

অতীত কালের খেউড়ের প্রতি প্রতিনিধিত্বকারী এই "কবি"র মধ্যে আধুনিক মার্জিত রুচির যুগেও কিছু কিছু আদিরসাত্মক অশ্লীল বিষয়ের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। যেমন, বিজয় সরকারের একটি "কবি": একদিন কুটিলা তার বৌদি রাধাকে নিয়ে শুয়ে আছে—এমন সময়ে আয়ান ঘোষ ঘরে এসে ঢুকলো। আয়ান কুটিলাকে অন্ধকারে কৃষ্ণ ভেবে "ঠ্যাং" ধরে টান দেয়, তারপর দুই ভাইবোনে মারামারি চলতে থাকে। এমন সময়ে বড়াইয়ের উক্তি অশ্লীলতার চরম :

ও তোর দাদার সাথে আঁধার রাতে
করলি আজ যে কাম
বলবে৷ ঘাটে পথে তোদের দুর্নাম
এই বুঝি ছিলো তোর মনে মনে ॥···
সরলা রাই রাজবালা তোর দাদার চেয়ে সাদারে।···

এই সমস্ত "কবি" খুব কম আসরেই গাওয়া হয়। কিন্তু কোনো আসরে একবার গাওয়া হলে, আদিরসের মাত্রা সেখানে কতো চরমে উঠতে পারে, তা কল্পনাসাধ্য।

সাধারণত রাধাবিরহ, ভাটিয়ালী বা ব্যক্তিগত সুখদুঃখ প্রসঙ্গের, আক্রমণাত্মক, দেহতত্ত্ব, আধ্যাত্মিক, সমাজ সংস্কারমূলক সমসাময়িক ঘটনা ইত্যাদি

বিষয় নিয়ে ধুয়াগান রচিত হয়। এর মধ্যে রাধাবিরহ ও ভাটিয়ালী গানগুলোর আবেগ ও আন্তরিকতা অধিক। উপমা-রূপক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে উক্ত আবেগসমূহকে অনেকেই যথেষ্ট আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন। যেহেতু এগুলো গাওয়া হয়, তাই ছন্দ জনিত অসুবিধা সুরের মধ্য দিয়ে পূর্ণ হতে পারে। অপেক্ষাকৃত তরুণ এবং নিম্নমানের কবিয়ালদের রচনায় অনেক সময়ে অসম ধ্বনির মিল থাকলেও, মোটামুটি প্রখ্যাত কবিয়ালগণ মিল সম্বন্ধেও যথেষ্ট সচেতন।

রাধাবিরহ গানগুলোয় রাধার সংলাপে কবিয়ালদেরই প্রেমচেতনার স্বাক্ষর থাকে। যেমন, রাজেন্দ্রনাথ সরকারের একটি গান :

আমার শ্যাম-প্রেম-পরশমণি
বুকে পেলে জুড়াইতো বুক
আমি আর কবে হেরিব চাঁদ মুখ।।
ভালোবাসা বাসা দিলেম যতনে পুষিয়া ছিলেম
হৃদয় পিঞ্জিরে শ্যাম-শুক।
হৃদয় পিঞ্জির ছিঁড়ে শ্যাম-শুক পাখি গেছে উড়ে
এখন এ পিঞ্জরে গুঞ্জরে পোড়া দুখ।। ইত্যাদি।

অথবা, রসিক সরকারের,[৪৫]

ননদী লো যা ফিরে যা ঘরে।
বলিস, ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণ-প্রেম-সাগরে।।
ঘুচলো তোদের সকল জ্বালা মুছলো কুলের কালি
কলঙ্কিনী রাই বলে আর কেউ দেবেনা গালি
ব্রজে আর হবে না কৃষ্ণকালী গোপন বাসরে।। ইত্যাদি।

রাধাবিরহের সঙ্গে ভাটিয়ালী নামাঙ্কিত ধুয়ার পার্থক্য খুব সূক্ষ্ম। উভয় ক্ষেত্রেই নারীকর্তৃক প্রেম ও বিরহ সংক্রান্ত আবেগের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ভাটিয়ালীতে অবশ্য পুরুষের উক্তিতে রচিত গানের সন্ধানও মেলে। এই ধরনের ধুয়াগানে বিজয় সরকারের কৃতিত্ব সর্বাধিক। তাঁর শিষ্য রসিক সরকারের ভাটিয়ালী ধুয়াও শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। বর্তমান শতকের কবিয়ালরা

এঁদের দ্বারাই কমবেশি প্রভাবিত হচ্ছেন। এই ধরনের গানের দু এক পংক্তি নিম্নরূপ :

(১) বিজয় সরকারের,

তুমি জানো না।
তুমি জানো নারে প্রিয় তুমি মোর জীবনের সাধনা।
তোমায় প্রথম যেদিন দেখেছি মনে আপন মেনেছি
তুমি বন্ধু আমার মন মানো না। ইত্যাদি।

(২) অনাদি সরকারের,[৪৬]

পশর নদীর ভাটির শেষে আসিয়া এই বাংলাদেশে হায়
বসে আছি সাগর কিনারায়।

আমার আপন বলে যারা ছিলো
তারা কোথায় যেন হারিয়ে গেলো
একা আমায় ফেলে গেলো নদীর মোহনায়।। ইত্যাদি।

(৩) অথবা, নারায়ণ সরকারের,

সব দিয়ে বন্ধুরে তোর মন যে আমি পেলাম না
জানলে আগে নিঠুর তোরে মন দিতাম না।
আমি আপন পর সব ভুলে এমন পথে পথে ঘুরতাম না।। ইত্যাদি।

আক্রমণাত্মক ধুয়া সাধারণত হাস্যরসের জোগান দেয়। বলা বাহুল্য, এ হাস্যরস ব্যঙ্গ এবং কৌতুকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কখনো কখনো এগুলো শ্লীলতার গণ্ডী অতিক্রম করে। এ সমস্ত গান সাধারণত আঞ্চলিক ভাষায় লেখা হয় বলে, কৌতুকটা আরো বেশি জমে। এই ধরনের ধুয়ার প্রথম রচয়িতা হিশেবে প্রফুল্ল বিশ্বাস নামক এক ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়।[৪৭] অপেক্ষাকৃত তরুণ কবিয়াল দিগেন্দ্রনাথ সরকারের[৪৮] এ ধরনের কিছু গান আছে। যেমন, প্রফুল্ল বিশ্বাসের গান,—

এঁড়ে গোরু বাঘের মুখতো দ্যাখো নাই।
পাল গুতায়ে বাছুর মেরে দেখাচ্ছে বলের বড়াই।। ইত্যাদি।

অথবা, দিগেন সরকারের—

অইতি আমার আনলো যেদিন এই সোংসার কত্তি
এটু সময় পালাম নাত্তো যাবো যে মত্তি।
ধর্ম্মের মদ্দি কী কম্মো যে কল্লো বাওনে।। ইত্যাদি।

দেহতত্ত্ব-ধুয়া বাউলের দেহতত্ত্বের অনুকরণে রচিত। আধ্যাত্মিক গানের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। কবিগানে আধ্যাত্মিক ধুয়ার প্রচলন সম্ভবত তারক সরকারের[৪৯] কণ্ঠেই প্রথম। কবিগানের "আলোচনা ও ধুয়া"র প্রবর্তক তিনি কিনা এ নিয়ে সংশয় আছে। কিন্তু এই ধরনের গানের উৎকর্ষে অশ্বিনী সরকারের[৫০] সমকক্ষ বিরল। তাঁর 'আমার এক চাকর আছে ভাই', 'মায়া-তেতুল গাছে কোন ভরসে বাসা বেঁধে রলি', 'সংসার-সাগর রূপে ভাই মানব মীন সেজেছে', 'আমি কেবল প্রেম ভিখারি', 'মান-অপমান যাহার সমান তার মতো আর মানীকে' ইত্যাদি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর আধ্যাত্মিক ধুয়া-গান। সম্প্রতি ইসলামধর্ম সম্বন্ধীয় এই ধরনের কিছু গানও কবিগানের আসরে পরিবেশিত হয়। যেমন স্বরূপ সরকারের 'কাবার দিকে এক করিয়া এক কাতারে মমিন ভাই, চলো সবে নামাজ পড়তে যাই', ইত্যাদি গান। ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত এ গানগুলোর মধ্যেও উপমা-রূপকের সার্থক ব্যবহার, খাঁটি আন্তরিকতা, সর্বোপরি সুরের দরদ, সব-ধরনের শ্রোতাকেই আকৃষ্ট করে।

সমাজ সংস্কারমূলক ধুয়াগান স্বভাবতই উদ্দেশ্যমূলক। কাব্যাদর্শের চেয়ে নৈতিক আদর্শের প্রতি এর ঝোঁক প্রবল। প্রসঙ্গক্রমে স্বরূপ সরকারের নাম করা যায়। পল্লী সমাজে ধর্মের নামে যে অন্ধ গোঁড়ামি এবং ভণ্ডামি প্রচলিত এই সব গানের মাধ্যমে সে সব তিনি তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন। নমুনা অংশে 'চুল দাড়ি আর টিকিতে লাগানো যুদ্ধ' শীর্ষক এই ধরনের একটি গান উদ্ধৃত করা হয়েছে। এটি বৈষ্ণব ও মতুয়া সম্প্রদায়ের অন্ধসংস্কারসমূহকে ব্যঙ্গ করে রচিত।

সমসাময়িক কালের বিষয় নিয়ে রচিত ধুয়াগুলোর সাহিত্যিকমূল্য খুব সামান্য। এগুলো প্রায়ই বক্তব্যপ্রধান। এতে কবিয়ালদের নিজস্ব কোনো আদর্শের পরিচয়ও পাওয়া যায় না। এমনও দেখা যায়, যে কবিয়াল ব্রিটিশ

সরকারকে প্রশংসা করেছেন,[৫১] দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরে, নিজে হিন্দু হওয়া সত্ত্বেও, পাকিস্তানের জয়গান করেন। বাংলাদেশ স্থষ্টির পরে পুনরায় তিনি এমন গান রচনা করেন, যেন এমন একটি দেশ তাঁর চির-আকাঙ্ক্ষিত ছিলো। দৃষ্টান্তস্বরূপ রাজেন্দ্রনাথ বা বিজয় সরকার উভয়ের নামই করা যায়। তবে ব্যক্তিজীবনের কোনো বিশেষ ঘটনাকে কেন্দ্র করে রচিত গান অনেক সময়ে বেশ উন্নতমানের হতে দেখা যায়। যেমন, রসিক সরকার তাঁর পাকিস্তান ত্যাগের সময়ে 'দেশের মাটি শেষের প্রণাম নিও' শীর্ষক গানটি রচনা করেছিলেন। গানটি পরবর্তীতে খুব জনপ্রিয় হয়।

কবিগানের কাব্যমূল্য এবং তার উৎকর্ষ বিচার করার সময়ে আমাদের সব সময়ে মনে রাখা উচিত যে, সাম্প্রতিক কালে উপস্থিত থেকেও কবিগানের চিন্তা-ভাবনা এবং আঙ্গিক উভয়ই মধ্যযুগীয়। কবিগান নগরের নয়, যদিও শহরের কোনো কোনো মহল কখনো কখনো কবিগান শোনার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করেন। নাগরিক মেজাজের শ্রোতাকে সে আনন্দ দিতে পারে না এই কারণে যে, সে অস্থিমজ্জায় গ্রামীণ এবং সে পল্লী সংস্কৃতিরই শুধু প্রতিনিধিত্ব করে। এইজন্যে শহরে অনুষ্ঠিত কবিগানেও অধিকাংশ শ্রোতা গ্রাম থেকে আগত এবং গ্রামবাসী; দু'এক পুরুষ আগে যাঁরা শহরে এসেছেন, তাঁরাও এর প্রতি অনুরাগী নন। কবিগানের কাব্যমূল্য ও উৎকর্ষ বিচারপ্রসঙ্গে কবিয়াল ও শ্রোতাদের অবস্থার কথা স্মরণ রাখলে কোনো প্রকার ভুল হবার সম্ভাবনা কম।

পাঁচ : অবক্ষয় ও তার কারণ

সৃষ্টির পর থেকেই কবিগান অবক্ষয়ের মুখোমুখি। আধুনিক যুগের সূচনায় সৃষ্ট এই গানগুলো স্থূলরুচি বিত্তবান জমিদার শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষণা লাভে সমর্থ হলেও চল্লিশের দশকের সমাজসংস্কারকামী ইয়ং বেঙ্গলদের কাছে কবিগান ছিলো যাত্রা-পাঁচালী ইত্যাদির মতোই নিকৃষ্ট শ্রেণীর বিনোদন-মাধ্যম।[৫২] পরবর্তীকালে কলকাতা নগরীর অধিকাংশ শিক্ষিত ব্যক্তিরই এই মানসিকতা সৃষ্টি হয়। উনিশ শতকের শেষ দিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতো ঐতিহ্য-প্রিয় ব্যক্তিগণ কবিগানের ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকার করলেও, তাই এর

কোনো স্থায়ী মূল্য স্বীকার করতে রাজি হননি।[৫৩] শিক্ষিতশ্রেণীর এই মনোভাব কলকাতায় কবিগান লালিত হওয়ার পক্ষে নিঃসন্দেহে বাধাস্বরূপ ছিলো।

অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত গ্রাম্যরুচির এবং মধ্যযুগীয় চিন্তাপ্রসূত কবিগান যাঁরা উপভোগ করতেন, তাঁরা অধিকাংশই সদ্য গ্রাম থেকে এসেছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁরা তাঁদের গ্রাম্য রুচিকেও বহন করে এনে থাকবেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংঘাতে পরবর্তী বংশধরদের অধিকতর অনুপ্রাণিত করে বিধায় কবিগান অবহেলিত হয়, কবিয়ালদের পসার কমে এবং ক্রমে কলকাতা থেকে লুপ্ত হতে শুরু করে।

এর পর কবিগান বাংলাদেশের বিভিন্ন পল্লীতে স্থান করে নেয়। একে বলা যেতে পারে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু, যেহেতু যথেষ্ট পৃষ্ঠপোষকের অভাব হয়, স্বাভাবিকভাবে কবিগান তাই ভাবে এবং ভাষায় কিছুটা ঐশ্বর্যহীন হয়ে পড়ে। তা সত্ত্বেও এর ধর্মীয় দিক কবিগানের রচনায় সব সময়ে আনু-কূল্য করে। কবিগানের অন্যতম বিষয় শাক্তধর্মীয় হওয়ায় এবং সাধারণত চণ্ডীমণ্ডপের সামনে কবিগান পরিবেশিত হওয়ায় শেষ পর্যন্ত কালীপূজায় কবিগান গাওয়া একটি প্রচলিত প্রথায় পরিণত হয়। ধর্মীয় উৎসবের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটায় কবিগান কখনোই সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হতে পারেনি। কবি-গানের বিকাশের উপযোগী আর্থ-সামাজিক পটভূমি আপাত দৃষ্টিতে না থাকলেও বিশ শতকের গোড়ার দিকে পুনরায় তার এক অভূতপূর্ব বিকাশ ঘটে, পূর্বে সে প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। উৎকর্ষের দিক দিয়ে এ সময়ের কবিগানকে অতীতের কবিগানের তুলনায় বরং উন্নততর বলা যায়।

কিন্তু কালীপূজার মতো কেবল একটি ধর্মীয় উৎসব কবিগানের বিকাশ বা লালনের পক্ষে যথেষ্ট নয়। তা ছাড়া বাংলাদেশে বিত্তবান হিন্দুদের সংখ্যাও নগণ্য। এই জন্যে পূর্ববঙ্গ তথা বর্তমানকালের বাংলাদেশ থেকে কবিগান লুপ্ত হতে শুরু করেছে। কলকাতা থেকে নির্বাসিত যে কবিগান বহুদিন পর্যন্ত পূর্ববঙ্গে টিঁকে ছিলো, সেখান থেকে তাদের এই ক্রমবিলোপ হয়তো চিরতরে লুপ্তিরই পূর্বাভাস। কিন্তু কবিগানের এ সম্ভাব্য অবক্ষয়ের কারণ কী? বিষয়টি নিরপেক্ষ বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে।

দ্বিজাতিতত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ভারত বিভক্ত হওয়ায় এবং পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে, প্রধানত হিন্দুধর্ম-নির্ভর কবিগানের ওপরে একটি প্রচণ্ড আঘাত আসে। কবিয়ালদের মধ্যে অনেক নিম্নবর্ণীয় হিন্দু থাকলেও সাধারণত উচ্চবর্ণীয় হিন্দুগণ এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অধিকাংশ কবিগানের আসর বসতো উচ্চবর্ণীয় হিন্দু-অধ্যুষিত এলাকার চণ্ডীমণ্ডপগুলোতে। দেশ বিভক্ত হওয়ায় উচ্চবিত্ত ও উচ্চবর্ণীয় হিন্দুদের ব্যাপকহারে দেশ-ত্যাগ কবিগান পৃষ্ঠপোষণার ক্ষেত্রে একটি প্রবল বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এতে কবিয়াল-দের গানের বায়নাই যে শুধু কমে যায়, তাই নয়, পারিশ্রমিকের পরিমাণও মাত্রাতিরিক্ত হ্রাস পায়। পেশা হিশেবে কবিগান রীতিমতো অলাভজনক হয়ে পড়ে। বাধ্য হয়ে নকুল দত্ত[৫৪] বা নিশি সরকারের মতো জনপ্রিয় কবিয়ালগণ পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। কবিগানের শ্রোতৃমণ্ডলীর একটি বিরাট অংশ পশ্চিম বঙ্গে বসবাস করতে শুরু করায়, সেখানে ধীরে ধীরে কবিগানের কিছু চাহিদা হয়। দেশত্যাগী কবিয়ালদের সেখানে দু'এক পালা করে বায়নাও হতে থাকে। ক্রমবর্ধমান হলেও তখন এর চাহিদা মোটেই আশাব্যঞ্জক ছিলো না। পূর্ব পাকিস্তানের বিপুল জনসংখ্যার ক্ষুদ্র একটি অংশ হিন্দু হওয়ায়, অন্যদিকে পৃষ্ঠপোষক হিন্দুদের অনুপস্থিতিতে কবিগান তখন উভয় বঙ্গেই একই রূপ ধারণ করে। ভাগ্যসন্ধানে কবিয়ালগণ তখন, কখনো পূর্ব-পাকিস্তানে কখনো পশ্চিমবঙ্গে এই ভাবে আসা-যাওয়া করতে থাকেন। জনপ্রিয় কবিয়াল বিজয় সরকারকে প্রতি বৎসরই এ রকম করতে হতো।

এই সময়ে যাঁরা অপেক্ষাকৃত তরুণ, কিন্তু যথেষ্ট প্রতিভাবান; তাঁদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে দাঁড়ায়। অনাদি, রসিক, ছোটো রাজেন, স্বরূপ; বিনয়, রবি, কালিদাস সরকারের[৫৫] মতো কবিয়াল, যাঁরা এরকম প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও মোটামুটি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, এঁদের ভবিষ্যৎও পুরোপুরি অন্ধ-কারাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। নিজস্ব পেশার অপ্রতুলতাহেতু বিজয় সরকার পর্যন্ত কখনো রামায়ণ, কখনো বা মোসলেম বয়াতী প্রমুখের সঙ্গে জারিগান গাইতেন। স্বরূপ সরকারের কোনো কোনো ধুয়াগানে যে জারিগানের সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তা সম্ভবত এই সময়ে জারিগায়কদের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্টতার ফল। বায়না না হওয়ায় এ সময়ে অনেকেরই কবিগান গাওয়া ছেড়ে দিতে হয়। অনেকের বায়নার পরিমাণ অনুল্লেখযোগ্য হয়ে দাঁড়ায়।

বরিশালের নন্দলাল সরকার (আচারিয়া), সিদ্ধেশ্বর সরকার ও দ্বিজবর সরকারের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[৫৬] এঁরা কবিগান প্রায় ছেড়ে দিয়ে কৃষিকাজ ইত্যাদি স্ব-স্ব পেশায় পুনরায় ফিরে আসেন। অনেকে আবার অতিরিক্ত পেশা হিশেবে কবিগানকে গ্রহণ করেন। অদ্যাবধি কবিগান কবিয়ালদের অতিরিক্ত পেশা। কবিগান ছাড়া বৎসরের অধিকাংশ সময় তাঁরা কৃষিকাজ, ব্যবসা বা শিক্ষকতা করেন। সবারই পৈতৃক জমি কিছু না কিছু থাকায় কৃষিকাজ তাঁদের একটি সাধারণ পেশা। অন্যান্য পেশার মধ্যে বিনয় সরকার কাপড়ের ব্যবসা এবং দিগেন সরকার গানের শিক্ষকতা করেন। শতাব্দীর গোড়ার দিকে পূর্ববঙ্গের অন্যতম জনপ্রিয় কবিয়াল রাজেন্দ্রনাথ সরকার ফরিদপুরের রাজৈর থানার অন্তর্গত চৌরাশি গ্রামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম প্রচার ও আশ্রম রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং কবিগান এক রকম ছেড়েই দেন। বস্তুত, পেশা হিশেবে কবিগানের ওপর পুরোপুরি নির্ভর করা আর কারো পক্ষেই সম্ভব নয়।

কবি গানের জনপ্রিয়তা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার পেছনে যুগের এবং মানুষের রুচির পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। দ্রুত নগরায়ণের ফলে, এমন কি, গ্রামের শিক্ষিত মানুষদের মধ্যে নাগরিক সংস্কৃতির প্রভাব ব্যাপকভাবে পড়ায় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ কবিগান শোনার জন্যে কখনোই তেমন আগ্রহ প্রকাশ করেন না। অন্যদিকে গ্রাম বা শহরের এই সব শিক্ষিত অর্ধ-শিক্ষিত ব্যক্তিরা একই সঙ্গে অধিকতর ধনী হওয়ায়, কবিয়ালদের প্রতি তাদের অবহেলা কবিগানের দীর্ঘজীবীত্বর অন্তরায় হয়। চতুর কবিয়ালগণ যদিও অনেকক্ষেত্রে যুগোপযোগী বিষয়ে গাইতে চেষ্টা করেন, তবু তাঁরা তার শেষরক্ষা করতে পারেন না। যেমন, নারায়ণ সরকার তাঁর "আলোচনা"র কিছু কিছু চুটকি গল্পে তরুণ শ্রেণীকে আকৃষ্ট করতে পারলেও বয়স্ক ব্যক্তিদের বিরক্তি-ভাজন হন। অন্যদিকে, কবিগানের এ ব্যর্থতার প্রধান কারণ, অধিকাংশ কবিয়ালরা হিন্দুপুরাণ সম্বন্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ, স্বভাবতই ঐতিহ্যপ্রিয় এবং অস্থিমজ্জায় আধুনিক সভ্যতার প্রতি বীতস্পৃহ। এই জন্যে আধুনিক যুগের রুচিকে তাঁরা পুরোপুরি আয়ত্তে আনতে বা সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করতে পারেন না। কবিগানের অবক্ষয় বা বর্তমানকালের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তাহীনতার কারণ এখানেই নিহিত বলে মনে হয়। তা ছাড়া আধুনিক

বিনোদন মাধ্যম, যেমন, রেডিও, টেলিভিশন, যাত্রা-থিয়েটার ইত্যাদির প্রসারের ফলেও কবিগানের জনপ্রিয়তা পরোক্ষভাবে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে ক্রমান্বয়ে কমে আসছে।

নমুনা

অতীতের কবিগানের মুখ্যবিষয় হলেও "ডাক-মালসী", "সখীসংবাদ" ইত্যাদি গানের জনপ্রিয়তা বর্তমানে খুব কম। "কবি" মোটামুটি জনপ্রিয়; অন্যদিকে ধুয়াগান সর্বাধিক জনপ্রিয় হওয়ায়, বর্তমানকালে রচিত একটি "কবি" (জবাব সহ) ও কয়েকটি ধুয়ার নমুনা উদ্ধৃত করা হলো।

কবি (প্রশ্ন, বেড় বা চাপান)

ধরণ—

একজন গরিব মানুষ কেশব ভুঁইয়ে
সন্ধ্যার পর বিছানায় শুইয়ে দীনতায় হীনতায় পূর্ণমন।

পাড়ন—

অনেক চিন্তার পরে বুড়ো বরে কন্যা দিতে চায়
সংসারের দায় নয়শো টাকা পণ ।।

প্রথম ফুকার—

ও সেই খবর পেয়ে বর জুটলো এক
কজ্জল বর্ণের লজ্জাহীন বজ্জাত
ও তার ছেলে মেয়ে আছে ঘরে বউ মরছে হঠাৎ।
বয়স প্রায় ষাটের উর্ধ্বে
হার মেনেছে সংসার যুদ্ধে
ভোগে আমবাত রোগে মধ্যে মধ্যে
পড়ে গেছে নীচের পাটির দাঁত ।।

মিশ—

সেই মেয়ের বয়স চৌদ্দো বছর সংবাদ পেয়ে তাই
নিমাই বালা বরের বেয়াই, বরকে দেয় মিঠে কড়া সান্ত্বনা

মুখ—

বেয়াই হে করি মানা
এমন শরিক-নাশা জরিমানা দিতে যেও না ।।

প্যাঁচ—

তোমায় টাকা দিলে হাজার খানেক
বন্ধুবান্ধব নিন্দে তোমায় করবে অনেক
টাকায় কি যৌবন পাওয়া যায় ।
হলে দোয়াজবরে কন্যা কিছু মানাতো তোমায় ।
ভাবে থাকিলে সমতা প্রাণে আসে মমতা
বেয়াই তোমার নাই কোনো ক্ষমতা
না বুঝে ভাব-ছাড়া লাফ দিও না ।।

খোঁচ—

আমি তোমার আত্মীয় পর ভাবিও না ।।

দ্বিতীয় ফুকার—

বয়স পঞ্চাশ উর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ
ধর্মশাস্ত্রের মর্ম তোমায় কই
হবে যোগে যুক্ত বিষয়মুক্ত স্বভাবে কালজয়ী ।
দিনে দিনে দিন ফুরালো
কাল পেয়ে কাল ঘনালো
তোমার চুল পাকিলো দাঁত পড়িলো
বেয়াই তোমার তা পাকিলো কই ।।

মিশ—

মোহের উন্মাদনায় সেজেছো ভাই উন্মত্ত বারণ
তোমায় বারে বারে করি বারন
মরণ পথে চরণ আর বাড়াইও না ।।

অন্তরা—

তোমার এই সখের জাল সাপের মাল সাধ করে গলেতে পরিও না ।
তুমি যন্ত্রহারা মন্ত্রহারা গো ভুল করে এই মরণ মরিও না ।।

তোমার পাক চুলেতে কলপ দিয়ে কালো করলে ভাই
টাক বন্ধ করিবার কোনো ব্যবস্থা তো নাই।
তার তো ঔষধ মেলে না।
তুমি বাহিরে যতো সাজ পরো গো
মন্ত্রের কাজ চোখ ঘুল্লিতে সারে না।
নারীর চক্র ভীষণ চক্র বোঝা খুব মুশকিল
তোমায় মুখে যেটুক ভালোবাসবে দিয়ে গোঁজামিল
তাতো তুমি বুঝবে না।
ব্রজের আয়ান ঘোষের দশা যেমন গো
পরে খায় ঘরের সব মাখন-ছানা ॥

দ্বিতীয় ধরণ—

যতো জ্ঞানী মানুষ ধরাতলে
দেশ কাল পাত্র ভেদে চলে
বেদে কয় সুপণ্ডিত তারে।

দ্বিতীয় পাড়ন—

কতো বোকা লোকে টাকার জোরে সাজে বুদ্ধিমান
তুমি তার প্রমাণ দিলে এবারে ॥

শেষ ফুকার—

কেন বার্ধক্যে ষোড়শী এনে বড়শী গলে বিঁধাতে চাও
তোমার বড়ো ছেলের বিয়ের বয়স তারে বিয়ে দাও
সংসারের বিষয়-বিষে এ জ্বালা জুড়াবে কিসে
নিয়ে সংগুরুর সৎ পরামিশে
দেশের মানুষ দেশে চলে যাও ॥[৫৭]

কবি (জবাব)

বেয়াই নিমাই বালা বুদ্ধির ঢেঁকি
বল্ দেখি বিয়ের বুঝিস কী।
আমার টাকা পয়সা যাবে না সাথে
তাই এই বিয়েতে সুখ করে রাখি ॥

তুমি বুড়ো মানুষ দেখে কেন করতেছ তামাসা এতো
জানো না শক্তি মোর কতো
শিখেছি বানের ভজন
যৌবন-শক্তি রসায়ন
বেয়াই তারও খেয়ে তিন চার ডজন হয়েছি ঠিক যুবকের মতো ॥

মিশ—

বেয়াই বৃদ্ধ মানুষ দেখে কেন করছো উপহাস
আমার গায়ে লেগে বসন্তের বাতাস
যৌবনের মৌবনে নিয়েছি ঠাঁই।
বেয়াই হে করি মানা আমার বিয়েতে বাদ সাধিও না
বেয়ানের দোহাই ॥

প্যাঁচ—

আছে ইতিহাসে পুরাকালে
অনেকে বিয়ে করতো বুড়াকালে
তাহাতে কম পড়তো না বল
হতো প্রাণায়ামে আয়ু বৃদ্ধি যৌগিক ক্রিয়ার ফল।
দেখো হক সাহেব বরিশালে
আশি বছরের কালে, ও তাঁর দিব্য ছেলে জন্ম নিলে
ঈশ্বর কি আমাকে করবে না তাই ॥

খোঁচ—

তোমার কথা শুনে আমার দুঃখের সীমা নাই ॥
দেখো আরবে মাবিয়া ছিলো
বয়স তার সাড়ে চার কুড়ি
বউ আশি বছরের বুড়ি
তার কাছে একদিন গিয়ে এজিদকে জন্মাইয়ে
দিলো এমাম বংশের মাথা খেয়ে
তার সাথে দিবো আজ আড়ি ॥

বললে, বেয়াইর নাই কোনো ক্ষমতা
এ কথায় বড়ো ব্যথা পাই
ক্ষমতা কোন খানে দেখাই

বেয়াই মোর কথা নিও আর বুঝি এ সব কইও
আমার বেয়ানকে পাঠায়ে দিও শক্তির পরীক্ষা দিতে তাই ।।

বললে, বড়ো ছেলের বিয়ের বয়স
বেয়াই তুমি তারে বিয়ে দাও
বেয়াই, এ কেমন কথা কও
ছেলে পাশ করুক বি. এ. তারপরে দেবো বিয়ে
তারে বি. এ-র আগে বিয়ে দিয়ে
ছেলের কি মাথা খেতে চাও ।।

নীচের পাটির দাঁত পড়েছে
এই কথায় বাধালে জঞ্জাল
খুলনা কি গিয়ে বরিশাল
গিয়ে ডেন্টিস্টের ধারে নতুন দাঁত দেব জুড়ে
শেষে বেয়ান যদি দর্শন করে
শেষকালে পুড়বে তোমার কপাল ।[৫৮]

ধুয়া গান

বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী (বিজয় সরকার)

(১) পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী একদিন ভাবি নাই মনে।
ওরে, সে যে আমায় ভুলবে জীবনে ।।

থাকতো পাখি সোনালী খাঁচায়
কতো কী বলিতো আমায় বসে রূপালী আড়ায়।
ফটিকের বাটি ভরে
কতো খাবার দিতাম থরে থরে, পাখি খেতো আনমনে ।।
জংলা পাখি করলো সর্বনাশ
এখন শুধু হায় হুতাশ করি কোন বনে তালাশ।
বনের পাখি বনে গেলো
আমার বুকে দিয়ে দারুণ শেল, নিঠুর পাখি গেল কোন বনে ।।

পাখির মায়ায় পড়ে কতো লোক
পেলো আমার মতো শোক তাদের জল ভরা দুই চোখ।
কে এমন দরদী আছে
বলে দেবে আমার কাছে, পাখি আমার গেল কোন বনে ॥
আগে যদি জানতাম পাখির মন
তারে দিতাম না এ মন, সে আমায় করিবে এমন।
অসীম গানের পাখি
তারে আপন বলে কেন ডাকি
পাগল বিজয় কাঁদে বসে বিরলে ॥

(২) পাগল করেছে কালার বাঁশিতে।
আমি কেন বা গিয়েছিলেম সই যমুনায় জল আনিতে ॥

মোহন মুরলী করে ঈষৎ বাঁকা বায়
ইশারাতে কথা বলে ভাবে বোঝা যায়
ও সে মন মজানো বাঁশি বাজায় কুলজার কুল নাশিতে ॥

হাসি মাখা মুখে যখন ওঠে বাঁশির তান
যেন সেই হাসি মাখায়ে বুকে হাসে ফুল বাগান।
আমার কেড়ে নিয়েছে মনপ্রাণ বঁধুর মধুর হাসিতে ॥

না জানি কেমনে আমার গোপন এ হিয়া
কোন শুভ লগনে তারে ফেলেছি দিয়া।
এখন বাড়ির পথে বারি নিয়া পারি না সই আসিতে ॥

পাগল বিজয় কয় সেই সুরে মুগ্ধ দেব–ত্রিদিবের
কী সাধ্য আছে বুঝতে তাই আবদ্ধ জীবের।
কালার বাঁশির গান শুনিয়া শিবের মন টিকলো না কাশীতে ॥

(৩) প্রেমের এতো জ্বালা যে সই আগে তো জানিতাম না
জানলে আগে বঁধুয়ারে মন–পরাণ দিতাম না।
মন ভুলানো মোহনীয়া আমায় কী দিয়া কী গেছে নিয়ারে
তার বিরহে মরি দহিয়া ঘরে নাই মোর সান্ত্বনা ॥

সে যে ফুল বিছানায় এসে আমার ভাঙলো কাঁচা ঘুম
চকিতে অলস চোখে মোর দিয়ে বিলাস চুম।
কুসুম যেমন আলোর লাগি আবেগে রাত কাটায় জাগি
আমি তেমনি বন্ধুর লাগি বসে আছি আনমনা ।।
পর কাঁদানো পরবাসী পরমপ্রিয় মোর
আমার পরাণে পরালো তাহার প্রীতির প্রেমডোর।
আমি পারি না তার বাঁধন খুলতে
আমি তারে আর পারি না ভুলতে রে
আমার স্মৃতির পটে চাহি তুলতে বন্ধুর রূপের আলপনা ।।

বনে যখন আগুন লাগে দেখে সবজনে
মনের আগুন কেউ দেখেনা পোড়ায় গোপনে।
বনের আগুন নেবে জলে মনের আগুন জলে জলেরে
যেমন কলের জাহাজ জলে চলে বুকের জ্বালা জুড়ায় না ।।

পাগল বিজয় বলে মানবাত্মা চির-বিরহী
তারে ছেড়ে এ সংসারে কেমনে রহি।
যার ইচ্ছাতে এলেম ভবে তারে আবার পেতে হবেরে
পাওয়ার বস্তু পাবো ঘরে চাওয়া পাওয়া রবে না ।।

(৪) তুমি জানো না
তুমি জানো নারে প্রিয় তুমি মোর জীবনের সাধনা।
তোমায় প্রথম যেদিন দেখেছি মনে আপন মেনেছি
তুমি বন্ধু আমার মন মানো না।

ফাগুন-দোল-পূর্ণিমায় মৃদুল মিঠেম বায়
ফুলবনে পুলকের আলপনা।
কতো মধুর মাধবী রাতে বধুঁয়া তোমারি সাথে
আমি করেছিলাম সে যামিনী যাপনা ।।

যেমন কাষ্ঠযোগে দাবানল পোড়ায়ে মারে বন-জঙ্গল
মন পোড়ানো আগুন বন্ধু তাহা না।

কতো বিরহীর অন্তরতলে বিনা কাষ্ঠে আগুন জ্বলে
জলে গেলে জ্বলে একি যাতনা ॥

তুমি চলে গেলে আমায় ফেলে কী আগুন মোর বুকে জ্বেলে
একদিনও দেখিতে মোরে এলে না।
তোমায় পেতাম যদি মোর কুটিরে দেখাইতাম বক্ষ চিরে
বুকের ব্যথা মুখে বলা চলে না ॥

আমি ঘুরি জনমে জনমে ক্ষিতি অপ তেজ মরুৎ ব্যোমে
খুঁজে ফিরি আমি তোমার ঠিকানা।
পাগল বিজয় বলে চিত চোর আসবে কি জীবনে মোর
বুকে রইলো ব্যথাভরা বাসনা ॥

(৫) ওরে আমার জীবন জীবন নদীর নাইয়ারে।
কবে আমার তীরে ভিড়াবে নাও ধীরে ধীরে বাইয়া রে ॥
বের হয়েছি সেই না ভোরে ধরণীর ধুলে
খেলা করে বেলা গেলো তোমারে ভুলে।
এখন দিনের শেষে নদীর কূলে রয়েছি দাঁড়ায়ে রে ॥

ষোলো আনা তবিল নিয়ে করেছি কারবার
জমায়ে শূন্য খরচ বেশি হয়েছে বার বার।
আমার হিশাবের কিছু নাই সারবার দেখেছি মিলায়ে রে ॥

নিজের হাতে নিজের বিপদ নিয়েছি গড়ি
নদীর কূলে কাঁদি এখন বিপদে পড়ি।
আমি দীন ভিখারি পারের কড়ি ফেলেছি হারায়ে রে ॥

মুছে গেছে আলোর রেখা দেখা যায় না পথ
অন্ধকারে হেঁটে আমি এলেম অন্ধবৎ
আমি সব ভুলে রয়েছি সতত, তোমার দিকে চাইয়ারে ॥

সাথী যারা গেছে তারা ফেলিয়ে আমায়
এখন বসে আছি দয়াল তোমার ভরসায়।

তুমি কাঙাল বলে এ অভাগায় দিও না ফিরায়ে রে ।।
পাগল বিজয় বলে আমি আছি ভবের এ কূলে
কবে এসে নাবিক বন্ধু লবে যে তুলে।
তোমার পারের তরী দিবে খুলে গোনের লগন পাইয়ারে ।।

রসিক সরকার

(১) আমি চিঠি লিখি তোমার কাছে ব্যথার কাজলে
আশা করি পরাণ-বন্ধু আছো কুশলে।
প্রথম নিও ভালোবাসা বুঝিও মোর মনের ভাষা
আমার গোপন আশা ভিজিয়ে দিলাম নয়নের জলে ।।

যে বাসরে আসি হাতে মিলাইলে হাত
ফুটালে মোর ভাঙ্গা বুকে প্রেমের পারিজাত।
যে বাসরে শূন্য হিয়া বসে থাকে পথ চাহিয়া
কাঁদে মন পাপিয়া গুমরিয়া এ বুকের তলে ।।

যে বকুলের তলায় বসে বাজিয়েছিলে বাঁশি
সে বকুলের মুকুলে আজ গন্ধ আলো হাসি।
আমার ছিঁড়ে গেছে গাঁথা মালা বুকে জাগে দারুণ জ্বালা
কাঁদি একলা ঘরে কুলবালা বসে বিরলে ।।

ভুলে যাওয়া পথটি ধরে ভুল করে এসে
পারো যদি দেখে যেও দিবসের শেষে
কেমন আছি পরের ঘরে বন্ধু দেখতে পাবে নয়নভরে।
কাঁদে বনবিহগী কেমন করে বাঁধা শিকলে ।।

কীযে লিখি কী যে বাকি পাই না খুঁজিয়া
অবলার না বলা ব্যথা নিও বুঝিয়া।
চিঠি আমার করি ইতি বন্ধু নিও আমার মনের প্রীতি
এ দীন রসিক বলে শেষ মিনতি চরণ-কমলে ।।

(২) ও ভাটির নদীরে একটু থেমে যাও।
কোন দেশে সে গেছে আমার আমায় কইয়া যাও ।।

সে দেশের ঐ আকাশ বাতাস ঝরায় কি গো আলো
সে দেশের প্রিয়া তারে বাসে কি গো ভালো।
সে দেশে কি তার লাগি বয় উতল দখিন বাও ॥

সে দেশেরই বনে বনে ফোটে কি গো ফুল
ফুলের বনে দোল দিয়ে গান গাহে বুলবুল।
সে দেশে কি গাঙে ভাসায় ময়ূরপঙ্খী নাও ॥

আমার দেওয়া মালা কি আর আজো গলে আছে
অভাগিনীর কথা কিগো সবি ভুলে গেছে।
কইও আমার ব্যথার কথা যদি দেখা পাও ॥

রসিক বলে থাক সে সুখে আমার দুঃখ নাই
দেশে ফেরার বেলায় যেন শেষের দেখা পাই।
বলবো শুধু পরাণ-বন্ধু বারেক ফিরে চাও ॥

(৩) ননদী লো যা ফিরে যা ঘরে।
বলিস ডুবেছে রাই কলঙ্কিনী কৃষ্ণ-প্রেম—সাগরে ॥
ঘুচলো তোদের সকল জ্বালা মুছলো কুলের কালি
কলঙ্কিনী রাই বলে আর কেউ দেবে না গালি।
ব্রজে আর হবে না কৃষ্ণকালি গোপন বাসরে ॥

ঝুলন দোল আর নৌকাবিলাস সবি হলো শেষ
প্রবাসে চলেছি আমি যেথায় বন্ধুর দেশ।
যেন দয়া করে শ্যাম, হৃষীকেশ এই আশিস দিস মোরে ॥

ভুলে যালো রাধা তোদের ছিলো কুলের বউ
শ্যাম বিনে জীবনে মরণে আপন নাই আর কেউ।
যার প্রাণে ওঠে অকূলের ঢেউ, কুলে তার কী করে ॥

বিদায় বেলায় ননদী গো, শেষ মিনতি নিও
আমার হয়ে শ্যামের কুঞ্জে সাঁঝের প্রদীপ দিও।
এ দীন রসিক বলে আমায় রাখিও, চরণ সেবার তরে ॥

(৪) তোমার আগে আমি যদি যাই দরদী গো
আবার যেন তোমায় আমি পাই।
যেন মরণ-পরে এক বাসরে দুইজনে পাই ঠাঁই ॥

হয়তো এক অশুভ সাঁঝে তোমায় হারা হয়ে
অচিন দেশে ধরবো পাড়ি বুকে ব্যথা লয়ে।
যেন বিধি আমায় দেয় মিলায়ে যদিও হারাই ॥

সুনীল আকাশে আমি একলা বসে রবো
দক্ষিণা বাতাসে এসে মনের কথা কবো।
তোমায় জীবনে মরণে পাবো আশায় আছি তাই ॥

সাঁঝের আকাশে আমি হবো সাঁঝের তারা
তোমা পানে চেয়ে রবো হয়ে আপন-হারা।
যেন দুই জীবনের দুইটি ধারা এক দেশে মিলাই ॥

রসিক বলে আসা যাওয়া তোমারই দুয়ারে
জীবন-মরণের টানে চলবো বারে বারে।
যেন জীবন-বীণার ছিন্ন তারে তোমার নামটি গাই ॥

(৫) ও বকুল বন জানিস যদি বন্ধু আমার গিয়াছে কোথায়
প্রিয় আমার গিয়াছে কোথায়।
সে কি ফুল ঝরানো বনের পথে গেছে মৃদু বায় ॥

এই পথে কি দেখেছিস তার হাতে ছিলো বাঁশি
চরণে নূপুর ছিলো মুখে মৃদু হাসি।
ও তার ছোঁয়া লেগে ঝরা ফুলে আঁখি তুলে চায় ॥

গন্ধে বিভোল মৌমাছি তার চূড়ায় উড়ে পড়ে
চপল দুটি আঁখির দিঠি মায়ার ফাঁসি গড়ে।
তারি লাগি কেঁদে ফেরে দোয়েল পাপিয়ায় ॥

ফুলকলি ফুটে ওঠে যে পথ দিয়া যায়
নদী তাহার গীতি গেয়ে উছলিয়া ধায়।
যেন জীয়ন কাঠির পরশ দিয়া সবারে জাগায় ॥

রসিক বলে বলরে নদী বলরে বনের পাখি
পরাণ-বঁধুয়া এই পথে গেছে নাকি।
আমি আর কতো কাঁদিবো বলো তার আশায় আশায় ।।

অনাদিজ্ঞান সরকার

(১) পশর নদীর ভাটির শেষে আসিয়া এই জংলা দেশে হায়
বসে আছি সাগর কিনারায়।
আমার আপন বলে যারা ছিলো
তারা কোথায় যেন হারিয়ে গেলো
একা আমায় ফেলে গেলো নদীর মোহানায় ।।

রাসপূর্ণিমার যোগে হেথায় মিলেছিলো মেলা
বন্ধু-বান্ধব মিলে করতে এলেম কতো খেলা।
এসেছিলেম পানসি করে
আমার নৌকা দিলো নোনায় মেরে
একা পড়ে বালুচরে করি যে হায় হায় ।।

দুদিন পরে ভাঙলো মেলা দেখতে পেলেম শেষে
(যাদের) সম্বায় সম্পদ ছিলো তারা ফিরে গেলো দেশে।
একা আমি সাথে নাই কেউ
সম্মুখে ওই সাগরের ঢেউ
আমার পিছনেতে ডাকিছে ফেউ কী করি উপায় ।।

কেমন করে ফিরবো আমি আপন ভবন
সম্মুখে অকূল বারিধি পিছে বাদা বন।
শূন্য হেরে সাগরের তীর
ভয়ে প্রাণ হলো অস্থির
উপরে বাঘ জলে কুম্ভীর যাবো কোন জায়গায় ।।

অনাদি কয় এমন দেশে আসিয়াছি বটে
এতো সুন্দর পানি তবু পিপাসা না মেটে।

কূল হারা এই সাগরের কূলে
বসে আছি আপন ভুলে
কেউ যদি রও আমার বলে উদ্ধারো আমায়।।

(২) সখী বিধাতা কি এতো দুঃখ লিখেছে আমার এ ভাঙ্গা কপালে
নিঙারি নিঙারি দুঃখ রাখিয়া এক ডালে
ফুটাইলো বিধি বুঝি আমার জীবন-ফুলে।।

পতঙ্গের ন্যায় দিয়েছি সই প্রেমাগুনে ঝাঁপ
এখন দেখি হলো সখি দুঃসহ প্রতাপ।
তোরা কেন করিস না আলাপ আমার দুঃখের কালে
আমার এ দুর্দশা তোদের পরামর্শের ফলে।।

চন্দন দিতেছিস তাতে এ প্রাণ না জুড়ায়
মাখে কুম্ভকার পুজে কাদা আগুন রাখার দায়।
তেমনি আমার হিয়ার আগুন দ্বিগুন দিলি জ্বেলে
কোন জনমের শত্রু তোরা ছিলি সই সকলে।।

সুখের অংশ নিলি তোরা সকলে মিলে
দুঃখ বুঝি শুধু সখি আমার কপালে।
আমি একা কাঁদি হাসি বসে তমাল তলে
তোরা কেন কাঁদিস না তেমন আমার দুঃখে গলে।।

আর কি সখী হবে না মোর এ জীবনের শেষ
এ জীবনে হবে না আর পেতে সুখ-লেশ।
করিব জীবনে প্রবেশ জীবনান্ত কালে
অনাদি কয় তারে ছেড়ে সুখ নাই কপালে।।

(৩) বধুঁ তোমার আশে বাঁধলেম বাসা শূন্য নদীর তীরে গো।
আছি পাতা ঝরা বটের তলে পাতার কুটিরে গো।।

না জানি এ কোন বা নদী কোন বা বটের তলা
তার তলে জীর্ণ কুটিরে কাটাই সারাবেলা।

ফুলগুলি মোর হলো বাসী একা আঁখিজলে ভাসি
বাজে অদূরে কার ব্যথার বাঁশি মলয় সমীরে ॥

চাঁদ যখন ঘুমায়ে পলো চেতন বনের কোলে
আমি তখন বাসর ঘরে ভাসি চোখের জলে।
ব্যর্থ হলো মালা গাঁথা এ জীবনে সবই বৃথা
কাঁদে রাতের পাখি একা একা থেকে ব্যথার নীড়ে ॥

জোনাকি ওই গাঁথে মালা কেয়া কাঁটার পাশে
আবার হিজল ফুলের ভিজে গন্ধ ভাসিছে বাতাসে।
কী বেদনা অঙ্গে মাখি ডাকিছে প্রহরের পাখি
তেমনি আমি কাঁদি থাকি থাকি আঘাত হানি শিরে ॥

কেউ বোঝে না আছড়ে কেন পড়ে নদীর ঢেউ
তেমনি আমার মনের কথা বুঝতে দরদী নাই কেউ।
বসে আমি দিন রজনী ঢেউ গণি আর তারা গণি
যেমন মেঘলা দিনের সরোজিনী ভিজে বর্ষার নীচে ॥

অনাদি কয় তীর ভাঙা ঢেউ নীড় ভাঙা একঝড়ে
ও তোর ভুল ভাঙ্গিবে পাতার কুটির যাবে যেদিন উড়ে।
সেদিন সে হয়ে দুরন্ত আসবে রে তোর প্রাণের কান্ত
ওরে যার তরে তোর জীবন অন্ত তারে পাবি পাবি ফিরে ॥

(৪) মানুষ হয়ে জন্মধরি বাঘের হাট ক্যান করবি বাস।
নাগের বাজার হবে মাজার ছাড়বি যেদিন শেষ নিঃশ্বাস ॥

নিজের থানা হতে কেন এলি ফকিরহাটে
রূপসা লাইনে রাঙা বগি পলি তাতে উঠে।
ও তুই চড়নদার বিনা টিকিটে, তোরে চেকারে করছে তালাশ ॥

ঘরজামাই বাপ মামার বাড়ি মার ঘরে জন্মি
স্বর্গাদপি গরীয়সী দেশ ভাবলে তুমি।
পেলে পিতৃধন আর মাতৃভূমি, সেদিন নিত্যধাম হবে প্রকাশ ॥

মধুমতীর জোয়ার ফেলে রূপসা হয়ে পার
যশোর ছেড়ে রাজধানীতে ছুটে চল এবার।
ও তুই গণেশ ভুট করা ব্যবসাদার তোর ভিটেমাটি হলো খাশ ॥
অনাদি কয় হায়রে আমি হারালেম দিশা
পাসপোর্ট আছে খুঁজে পাইনা জীবনের ভিসা।
এবার শ্রীগুরুচরণ ভরসা হই যেন তার পায়ের দাস ॥

(৫) কী পোকায় কামড়ালো আমায় রে মরমিয়া
বিষের জ্বালায় মরিলাম জ্বলিয়া।
দিলো লক্ষগুণ কে বক্ষ মাঝে আগুন জ্বালিয়া ॥
রূপসা নদীর দক্ষিণ পাশে ফুলতলার যে বাঁক
খেয়াঘাটে কেয়া কাঁটার মাঝে ছিলো কাক।
তার মাঝখানে বেঁধেছে চাক মৌমাছি মিলিয়া ॥
কোন পিয়াসে মধুর আশে ঢুকে নেশার ঝোঁকে
মৌচাকে আঘাত দিয়ে চেয়ে দেখি চোখে।
কামড়ায় চারদিকে হাজার মৌপোকে গুঞ্জন তুলিয়া ॥
মুখে তাদের মধু মাখা পাখায় গুনগুনানি।
পিছনে তার বিষ রয়েছে আগে কি আর জানি।
জানিলে দেখিলে মৌচাক ফুল-বনানী যেতাম যে ভুলিয়া ॥
আগে যদি জানতেম আমি বিষম ক্রিয়া বিষে
জীবনে যেতেম না এমন মধু খাওয়ার দেশে।
আমি বুঝতে পারলেম বুদ্ধি আসে চোর গেলে পালিয়া ॥
অনাদি কয় একা কি আর পোকার কামড় খাই
বিশ্বের দৃশ্য চেয়ে দেখি ভুগিছে সবাই।
আমরা মুখপোড়া রামভক্ত সবাই দেখি চোখ মেলিয়া ॥

দ্বিজবর সরকার

(১) এ বিশ্ব তোমার করুণায়
তুমি করুণার নিদান আমি তোমার কী গাহিবো গান।
তোমার সঙ্গীতের লহরী মাঝে শুনি প্রেমিক ভক্ত করে স্নান ॥

সঙ্গীতের সিন্ধু মাঝে গভীর রাগ রাগিণী
অযোগ্য দুর্ভাগ্য বলে কিছুই শিখিনি ।
এখন আমার কণ্ঠে তুমি গেয়ে দয়াল তুমি শোনো তোমার গান ।।

রামপ্রসাদের কণ্ঠ-সুরে অনুরাগ ভরা
তাইতে আমার মা শঙ্করী বাঁধলো তার বেড়া
আমি কপাল পোড়া লক্ষ্মীছাড়া তোমার দরশ পরশ পাবো ক্যান ।।

তারক গোঁসাই গান করেছে হরিচাঁদ ভাবি
জন্মান্ধ অশ্বিনী গোঁসাই রইলো সেই ভাবে ডুবি ।
হরিবর মনোহর সবি গুরুচাঁদের কোলে পেলো স্থান ।।

বড়ো রাজেন্দ্র নকুল নিশি আরো নন্দলাল
পরাণ খুলে তোমার গীতি গাইল রসিকলাল ।
পাগল বিজয়ের শুনলে ভাটিয়াল শুকনা গাঙে ছোটে বান ।।

ছোটো রাজেন অনাদি কালা রবি নারায়ণ
স্বরূপও অরূপে ডুবে হলো মহাজন ।
অধম দ্বিজবরের মনের বেদন, গুরুচাঁদ শুনবে কি ভিক্ষুকের গান ।।

(২) আমার হাসিকান্নার মাঝারে পরাণ বন্ধুরে কি পাবো ফিরিয়া ।
আজ যাবে কাল আসবে বলে রে গেলো দুঃখিনীর পরাণ নিয়া ।।

আজ যাবে কাল আসবে চলে ভেবেছিলাম মনে
সে কাল আমার কাল হয়েছে বিরহ পরাণে ।
আমি সকাল বিকাল করি মনে বঁধুর চলার পথে বসিয়া ।।

চলতে পথে ঝরা পাতা পড়ে মাটির পর
মনে ভাবি এই তো বন্ধুর বিদায় উপহার ।
তখন কান্নায় ভাঙে গোপন অন্তররে ও তার স্মৃতি মনে পড়িয়া ।।

কাছে পেলে ব্যথা জাগে, কাঁদে পরাণ দূরে গেলে পর
ভালোবাসায় এমন দশা কহে দ্বিজবর ।
মানুষ ঘর বেঁধে প্রণয়-দ্বীপের পর আছে মর জগতে বাঁচিয়া ।।

(৩) কেন মন দিয়া পাবো না তারে আগে তো সই জানি না।
সেই থেকে হয়েছি পাগল বিষয়-আনমনা।
ও যার মনের খবর সে জন জানে অন্যে কভু জানে না ॥

মনের ব্যথায় ব্যাকুলতায়
শাখী শাখে বসে পাখি আপন মনে গায়।
সে যে না পাওয়ার বেদনা লয়ে গেয়েছে তার গানখানা ॥

তারে কি ভুলতে পারি লোকেরি কথায়
ক্ষণেক পরে পোড়া মন তার রূপ ধরে দাঁড়ায়।
যখন, আর কিছু মেলে না চাওয়ায়, শুধু আশার জালবোনা ॥

দ্বিজবর কয় চাওয়া পাওয়া পরিপক্ক হয়ে
প্রেমভক্তি ফুটে উঠুক ভাব আশ্রয় লয়ে।
শেষে কৃষ্ণ প্রেমের বন্যা পেয়ে ঘটবে অকাম-কামনা ॥

(৪) তোমারে দেখিতে প্রাণে চায় পরাণ বন্ধুরে
তোমারে দেখিতে প্রাণে চায়।
আমার মন ভুলানো প্রাণ জুড়ানো দরদিয়ায় ॥

বিরলে বসিয়া ভাবি তোমায় আর দেখবো না
নয়নে মানে না মানা পরাণে বোঝেনা।
করি যার লাগিয়া আনাগোনা সে রইলো কোথায় ॥

ভুলি ভুলি মনে করি ভোলা নাহি যায়
তবু পরাণ কেঁদে ওঠে অজানা ব্যথায়।
যেমন বুকের ব্যথা নাহি লুকায় যুক্তি তর্কের মীমাংসায় ॥

দ্বিজবর কয় মনের খাদ্যের বেশি হয় ওজন
না পেলে পর ঘটে তাহার অকালে মরণ।
যেমন শীতকালে জলে সন্তরণ গোধূলি বেলায় ॥

(৫) যারা তোমায় বাসে ভালো তারা কতো ভালো
তোমায় ভালো বাসলেম না তাই কাঁদতে জনম গেলো।
আমার কী দুর্ভাগ্য হই অযোগ্য, গোণা দিন ফুরালো ॥

ভালোবেসে তোমায় যারা দিলো জাতিকুল
তাদের ভরা যায় না মারা অকূলে পায় কূল।
তাদের মরা বাগে ফুটেছে ফুল ঝরছে চাঁদের আলো ॥

হরিচাঁদের রূপের আলো উদ্ভাসিত দেশ
গুরুচাঁদ সেই আলো নিয়া ছড়ালো দেশ দেশ।
তাই ঘটিলো চাঁদের সমাবেশ এ দেশ আলোকিত হলো ॥

দ্বিজবর কয় চাঁদের দেশে জন্মিলাম এবার
উলুকের অন্ধকার ভালো সেই দশা আমার।
দয়াল গোপাল চাঁদের বাঙ্গা এবার যা হবার তাই হলো ॥

স্বরূপেন্দু সরকার

(১) আমরা বাংলাদেশের চাষী আমরা বাংলাদেশের চাষী
যাদের ত্যাগে জাগে দেশ সকলের মুখে ফোটে হাসি।
ও সে চাষীর কী দুর্দশা সবে দেখে যাওনা আসি ॥

জনকের মতো সতত জোগাই যাদের অন্ন
যাদের তরে মরছি খেটে তারা কয় নগণ্য।
মুখে কেবল দরদ দেখায় মূলে মোর রক্ত চুষে খায়
মোদের টাকায় পাঁচতলা হাঁকায়, কেউ দেখলোনা তা আসি ॥

জলে ভিজে রোদে পুড়ে জল হয় আমার রক্ত
পুঁজিবাদীর বাড়ে ভুরি, শক্ত হলো তক্তো।
(আমার) রোগের দায় ফুরালো বেছন, ঘরের চালাতে নাহি ছোন
রান্নাঘরে ছুঁচোর নাচন, গোয়ালে গেলে যায় বুক ভাসি ॥

মোদের কথা বলে যাদের ভরে ভোটের বাক্সো
দেশদরদী তারাই আবার দ্বিগুন ধরে ট্যাক্সো।

বলো না ভাই কোথায় যাবো, সব খানেতেই মার খাবো
যদি কিছু চাবো পাবো, গলে সুদের ফাঁসি ॥

স্বরূপ কহে আর কতোকাল এই দধিচির দল
কাঠগড়াতে ঝুলবে ফেলবে করুণ চোখের জল।
খাঁটি দেশদরদী যারা, আজো কি দেবে না সাড়া
হবে সোনার বাংলা লক্ষ্মীছাড়া মরে যদি চাষী ॥

(২) চুল দাড়ি আর টিকিতে লাগলো যুদ্ধ।
এরা ভাবে ভবে সবে মন্দ নিজেরা অতি শুদ্ধ ॥

এঁদের একদলের তুলসীর মালা গলে, গেরো মাটির তিলক ভালে
কাঁথার ঝোলা বাম বগলে, ডান হাতে গোপীর বাদ্য।
মুখে শব্দ হরে কৃষ্ণ, প্রশ্ন করলে মেজাজ উষ্ণ
কাছে গেলে বলে ছুঁসনে, টিকি নেড়ে হয় ক্রুদ্ধ ॥

পরে আইচার মালা আর একদলে, দল বেধে তাহারা চলে
কোনো লোকের বাড়ি গেলে বিরক্ত গোষ্ঠীসুদ্ধ।
লম্বা দাড়ি চুল মুখ মাথায় তেল মাখায়ে আসে কাঁথায়
চামসে গন্ধ গায়ের ছাতায় ধারে যাবে কার সাধ্য ॥

এদের দুদলের মূলের ভাবধারা দিলো যা হরি আর গোরা
জুটে একদল খিরোই-চোরা নষ্ট করলো সবসুদ্ধ।
করতে ব্যবসা গুরুগিরি, নিত্য নতুন বিধান জারি
নিজেকে করতে জাহিরি, দুই গোঁসাইর করলো শ্রাদ্ধ ॥

আর গোরাচাঁদের ভাব যদ্যাপি সুনীচেন তৃণাদপি
নাম যদি নেয় হোক না পাপী প্রেম ডোরে করো বদ্ধ।
দ্বাদশ আজ্ঞা হরিচাঁদের কাটিবে অমানিশা ঘের
কিসের ডোম আর মুচি কিসের ভক্তের কী শুদ্ধাশুদ্ধ ॥

এরা নিজে ভালো অন্যে মন্দ দিন রাত্র শুধু এ দ্বন্দ্ব
গায়ে আসে না মানসের গন্ধ, ভাব দেখায় বাক্যসিদ্ধ।

পলো ডাক্তার কবিরাজ সঙ্কটে এই ব্যাটাদের ঠেলার চোটে
স্বরূপ কয়, কয় পাগল খাটে ছোট, এক হাটের মধ্য ॥

(৩) আমি আর কতো কাঁদিবো তোমার আশা পথ চেয়ে গো।
গেলো হৃদাকাশ মোর আলো বিনে কালো মেঘে ছেয়ে গো।

আসার আশে কেঁদে কেঁদে ঘোর হলো দুআঁখি
আরো মোরে কাঁদাইতে আছে নাকি বাকি।
আমারে কাঁদায়ে যদি সুখে থাকো নিরবধি
আমি সারা জীবন যেন কাঁদি তোমাকে না পেয়ে গো ॥

কতো কহি পোড়া পরাণ তবু নাহি মানে
গত দিনের শত ব্যথা ভেসে ওঠে মনে।
গভীর রাতে আলো জ্বেলে বসে থাকি দুয়ার খুলে
চলে মলয় পবন দুলে দুলে ব্যথার গীতি গেয়ে গো ॥

কতো দিবস মালা গেঁথে নিশি করি ভোর
আমার গাঁথা মালা বাসী হলো ঝরে আঁখি লোর।
বাসী মালা লয়ে করে তোমারে স্মরে অন্তরে
ভোরে স্রোতস্বিনীর বুকের পরে দিয়েছি ভাসায়ে গো ॥

তবু তুমি নাহি এলে আমার হৃদিবাসে
রচি আসার বাসর বসে বসে বনবীথির পাশে।
কামনা কুসুম ছিঁড়ে পিরিতি পালঙ্ক পরে
রাখি আরতি-বিছানা করে আরোপে বিছায়ে গো ॥
ভালোবাসায় এতো জ্বালা জানতেম যদি আগে
ভুল করে না জড়াইতেম তোমার প্রেম-সোহাগে।
স্বরূপ কয় প্রেম সোহাগী লো পাওয়া হতে চাওয়া ভালো
পেয়ে কবে কে জুড়ালো প্রেমের পোড়া হিয়ে গো ॥

(৪) জানিতে চাই গোঁসাই তোমার ভগবান কেমন।
তারে কেউ কয় হরি কেউ গড আল্লা চোখে কি দেখে কখন ॥

তোমার সে ঈশ্বরের স্বরূপ কী
সে রূপ আসল না মেকি
শুধু বোকা লোক বুঝাতে কবির কল্পনা নাকি।
বুঝি কল্পনার জাল বুনে রাখিয়াছ ঢের নামকরণ ॥

ভাববাদী কি অবতার নবী
যেভাবে আঁকিল ছবি
তাতে বুঝি সবে চাঁদ দেখেছে, কেহ দেখেনি রবি।
তাদের এক একজনের ভাব আজগুবি ডুবে নাকো জ্ঞানীর মন ॥

কোরান পুরাণ বাইবেল কিংবা বেদ
পড়ে যায় না মনের ক্লেদ
যতো পড়ি ততো গড়ি বিশ্ব প্রেম বিচ্ছেদ।
দেখে সাধু পোপ আর পীরের বিভেদ নাস্তিকতায় ডুবলো মন ॥

স্বরূপ কয় সে রূপ যদি পাবি
জগৎ আপন নে ভাবি
সেবা ধর্মের মাঝে পাবি প্রেম রাজ্যের চাবি।
শেষে মিটবে সকল চাওয়ার দাবি, ঘটবে তোর আত্মদর্শন ॥

(৫)　ভবের হাটে দোকান পেতে সার হলো বেচা কেনা
জীবনে কী লোকশান হলো বুঝলি না মোনা।
দিলি জিরার দরে হীরা মণি, কাঁচের বিনিময়ে সোনা ॥

তুই হতে পারতি মহাজন নিজের না বুঝে ওজন
অধিক লাভের আশে আসল দিলিরে দাদন।
এর পরিণামে শুধুই কাঁদন জানিস নারে দিন কানা ॥

আছে জমানো মাল যাহা গুদামে বেচে দিসনে বেদামে
ফুসলাইবে ছটি দালাল আছে মোকামে।
তারা সর্বক্ষণে ডাইনে বামে করিছে আনাগোনা ॥

পড়িলে দালালের পালাতে কেহ নারে পালাতে
যাদুকরের গুটির মতো পারে চালাতে।
আগে মন লোহা পারলে গালাতে তার দলে ষোলো আনা ॥

স্বরূপ কহে ওহে মোনারাম আগে সার মনের ব্যারাম
যা আছে সামলায়ে পাবি অন্তিমে আরাম।
হাতে কাজ করিয়া মুখে নে নাম, দেহ-জমিতে ফলবে সোনা ।।[৬০]

তথ্যনির্দেশ

১ প্রমাণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে 'কবি-সংগীত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "এই কবির গান···এক সময়ে বঙ্গ সাহিত্যের স্বল্পক্ষণস্থায়ী গোধূলি-আকাশে অকস্মাৎ দেখা দিয়াছিল, তৎপূর্বেও তাহাদের কোনো পরিচয় ছিল না, এখনও তাহাদের কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।"—'কবি-সংগীত', লোকসাহিত্য, রবীন্দ্র রচনাবলী, ষষ্ঠ খণ্ড (কলিকাতা : বিশ্বভারতী, ১৯৪১), পৃ. ৬৩২

২ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, 'কবি' (পাকিস্তানী সংস্করণ ; ঢাকা : স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৬৮)।

৩ শ্রী। প্রফুল্লচন্দ্র পাল, 'প্রাচীন কবিওয়ালার গান' (কলিকাতা : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৮), পৃ. ৩৯০

৪ পুলক চন্দ, 'গণকবিয়াল রমেশ শীল ও তাঁর গান' (কলিকাতা : কথাশিল্প, ১৩৮৫)

৫ শ্রী ধর্মানন্দ মহাভারতী, 'ভোলাময়রা', সাহিত্য-সংহিতা (কলিকাতা : চৈত্র ১৩১১), পৃ. ৬৫৮

৬ "The Kabisongs had originally constituted parts of old yatras or popular plays."---Dinesh Chandra Sen, B. A., Bengali Language and Literature (Calcutta : Calcutta University, 1911), p. 697

৭ Sushil Kumar De, Bengali Literature in the Nineteenth Century (2nd edn.,Calcutta : Firma K.L. Mukhopadhyay, 1962), p. 277

৮ শ্রীসুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' (কলিকাতা: মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৪০), পৃ. ১০৪৬

৯ আনন্দচন্দ্র মিত্র, 'কবির গান', সাহিত্য-সংহিতা (কলিকাতা : বৈশাখ ১৩১২), পৃ. ৫৮

১০ সুকুমার সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৪৭

১১ ঐ, পৃ. ১০৫১

১২ সুকুমার সেনের পূর্বোক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. ১০৪৬

১৩ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,' চতুর্থ খণ্ড (কলকাতা : মডার্ণ বুক এজেন্সী, ১৯৭৩), পৃ. ৪৪

১৪ ঐ, পৃ. ৪৬

১৫ ব্রজসুন্দর সান্যাল, 'কবিওয়ালা ৮', নব্যভারত (কলিকাতা : ফাল্গুন ১৩১৩), পৃ. ৫৭৫

১৬ এঁদের বিস্তারিত বিবরণের জন্যে দ্রষ্টব্য, নিরঞ্জন চক্রবর্তী, 'ঊনবিংশ শতাব্দীর কবিওয়ালা ও বাংলা সাহিত্য' (কলিকাতা : ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৮৮০ শকাব্দ), পৃ. ৪১-১৩৭

১৭ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

১৮ ১৮৯২ সালে খুলনা জেলার অন্তর্গত মোল্লাহাট থানার বইঝাকি গ্রামে রাজেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দুই মামা হরিবর সরকার ও মনোহর সরকার কবিগান করতেন। মাতামহ আনন্দ সরকার এতদ-ঞ্চলের প্রাচীন কবিয়াল তারকচন্দ্র সরকারের সঙ্গে বহুদিন যাবৎ একত্রে গান করেন। রাজেন্দ্রনাথের গুরু ছিলেন ঢাকা-র হরিচরণ আচার্য। সম্ভবত, ১৯০৭ সালে রাজেন্দ্রনাথ কবির দলে প্রবেশ করেন এবং গুরু হরি আচার্য, মামা হরিবর ও মনোহর, কামিনী সরকার, মহিম সরকার, নকুল দত্ত, বিজয়, নিশি প্রমুখের সঙ্গে গান করতেন। সমাজ সচেতনতা ও সংস্কারমূলক মানসিকতা এঁর প্রবল ছিলো। তিনি বিধবা-বিবাহকে সমর্থন করতেন এবং কালীপূজায় পাঁঠা বলির তীব্র বিরোধিতা করতেন। ১৯৭৪ সালে ইনি মারা যান।

১৯ অনাদিজ্ঞান সরকার সম্পাদিত 'রাজেন্দ্রমেলা', ১৩৮৬ (গোপালগঞ্জ) পত্রি-কায় গানটি মুদ্রিত হয়েছে।

২০ বিজয় সরকার, 'বিজয়কৃষ্ণ অধিকারী' নামেও পরিচিতি। তিনি ১৯০১ সালে যশোরের নড়াইল থানার অন্তর্গত ডুমদি গ্রামে জন্মগ্রহণ

করেন। প্রথম জীবনে তিনি একজন 'কড়চা-গায়ক' ছিলেন। পরে কবিগান শুনে এর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ১৯২২-২৩ সালের দিকে মনোহর সরকারের শিষ্য হিশেবে তাঁর কাছে তালিম নেন। কবিগানের "আলোচনা" অংশের ধূয়ায় ভাটিয়ালী সুরের প্রবর্তক হিশেবে এর নাম উল্লেখযোগ্য। বিশেষত, তাঁর 'পোষা পাখি উড়ে যাবে সজনী একদিন ভাবি নাই মনে' গানটি খুবই জনপ্রিয়। বিজয় সরকার বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে বাস করেন।

২১ উক্ত প্রশংসাপত্রটি মোল্লাহাটের চুনখোলী নিবাসী শ্রী অনাদিজ্ঞান সরকারের কাছে রক্ষিত আছে।

২২ যেমন, বিজয় সরকারের, "তোমায় নম নম বঙ্গমাতা, স্নেহের আসন বুকে পাতা, পালিছ মা সাতকোটি সন্তান"-শীর্ষকে মালসী গান।

২৩ নিরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩২

২৪ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯২

২৫ এ প্রসঙ্গে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তাঁর কবিজীবনী-তে আকর্ষণীয় একটি তথ্যের উল্লেখ করেন। শ্রোতারা নিতাই নামক কোনো এক কবিয়ালকে বিরহ-বিষয়ক গানের পরিবর্তে খেউড় গাইতে অনুরোধ জানিয়ে বলে,—"হ্যাদ্ দেখ্ লেতাই, য্যার যদি কালকুকিলির গান ধল্লিতো, দো, দেলাম, খ্যাড়গা।" দ্রষ্টব্য, অসিতকুমার বন্দ্যো-প্যাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১। বর্তমানে অনুরূপভাবে শ্রোতারা বলেন, "সরকার মশাই, পোষাপাখির ধুয়াটা একবার ধরুন", ইত্যাদি।

২৬ অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

২৭ নিরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪১—১৩৭

২৮ সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, "রমেশ শীল : অগ্রথিত গীতিগুচ্ছ", সাহিত্য পত্রিকা (ঢাকা : শীত ১৩৮৯), পৃ. ৪৪

২৯ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩-৬৪

৩০ অবশ্য একথাও স্বীকার করা কর্তব্য যে, বাংলাদেশের কোনো কোনো অঞ্চলে এখনো পূর্বাবস্থা বজায় আছে। যেমন, ১৯৮০ সালে ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন আয়োজিত কবিগানে খুলনার কবিয়াল স্বরূপেন্দু সরকার মার্জিত পোশাক ব্যবহার করলেও, কুমিল্লার কবিয়াল প্রতিদ্বন্দ্বী কালোশশী চক্রবর্তী এবং তাঁর সঙ্গীগণ নূপুর ইত্যাদি ব্যবহার করেন।

৩১ 'খুলনার লোককবি' গ্রন্থে নূর মুহম্মদ টেনা এ প্রসঙ্গে একটি ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন। কবিয়াল রসিক সরকারকে তিনি উচচ-মাধ্যমিক পাশ বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু তা সত্য নয়। রসিক সরকার মাধ্যমিক পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হননি। দ্রষ্টব্য, নূর মহম্মদ টেনা, 'খুলনার লোককবি' (খুলনা : কালান্তর প্রকাশনী, ১৯৮১), পৃ. ৩১

৩২ নিরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩

৩৩ মতুয়া ধর্ম-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক ওড়াকান্দি-ফরিদপুরের হরিচাঁদ ঠাকুর। এঁর জন্ম ১৮১২ খ্রীস্টাব্দে নমঃশূদ্র পরিবারে। ইনি বর্ণাশ্রমের তীব্র বিরোধিতা করেন। হিন্দু সমাজের বহু সংস্কার মতুয়াদের কাছে বর্জনীয় মনে হয়। এঁরা হিন্দুধর্মের গুরুবাদ স্বীকার করেন না। বাংলাদেশে নিম্নবর্ণীয় হিন্দুদের জাগরণের পেছনে হরিচাঁদ এবং তাঁর পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের দান অপরিসীম।

৩৪ প্রফুল্লচন্দ্র পাল, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫২

৩৫ ঐ, পৃ. ৩৬৫

৩৬ নারায়ণ সরকার কবিয়াল হিসেবে তরুণ। জন্মস্থান যশোরের কালিয়া থানার ডুটকুরা গ্রামে। এঁর গুরু অনাদি সরকার। ১৯৭১-৭২ সালের দিকে ইনি কবিগান গাইতে শুরু করেন এবং কিছু দিনের মধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

৩৭ বরিশাল জেলার অন্তর্গত নাজিরপুর থানার কাঠালিয়া গ্রামে ১৯১৯ সালে দ্বিজবর সরকার জন্মগ্রহণ করেন। মাতা গঙ্গামণি দেবী মতুয়া সম্প্রদায়ে দীক্ষিতা ছিলেন এবং আধ্যাত্মিক গান খুব ভালো গাইতে পারতেন। ১৯৪৭-এর আগে জনপ্রিয়তা থাকলেও পরে এঁর জন-প্রিয়তা কিছু হ্রাস পায়। ''আলোচনা''য় ইনি প্রচুর আঞ্চলিক শব্দের ব্যহার করেন।

৩৮ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩২-৩৮

৩৯ যেমন, আনন্দচন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭

৪০ নিরঞ্জন চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৪১ যেমন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, ''সুনিয়মিত ছন্দের বন্ধন না থাকাতে এই সমস্ত অযত্নকৃত রচনাগুলিকে শ্রোতার মনে মুদ্রিত করিয়া দিবার জন্য ঘন ঘন অনুপ্রাসের বিশেষ আবশ্যক হয়। সোজা দেয়ালের

উপর লতা উঠাইতে গেলে যেমন মাঝে মাঝে পেরেক মারিয়া তাহার অবলম্বন সৃষ্টি করিয়া যাইতে হয়, এই অনুপ্রাসগুলিও সেই রূপ ঘন ঘন শ্রোতাদের মনে পেরেক মারিয়া যাওয়া ; অনেক নির্জীব রচনাও এই কৃত্রিম উপায়ে অতি দ্রুতবেগে মনোযোগ আচ্ছন্ন করিয়া বসে।" উনিশ শতকের প্রখ্যাত কবিয়াল রাম বসুর 'গেল গেল কুল কুল, যাক কুল—তাহে নই আকুল' ইত্যাদি পদের উদাহরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বিষয়টি স্পষ্ট করতে চেষ্টা করেন। দ্রষ্টব্য, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৪

৪২ নিশিকান্ত সরকার সংক্ষেপে নিশি সরকার নামে পরিচিতি। আনুমানিক ১৯০৫ সালে ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া থানার ভৈরব নগর গ্রামে নিশি সরকার জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা চন্দ্রকান্ত সরকার একজন রামায়ণ-গায়ক ছিলেন। খুব অল্প বয়সেই নিশিকান্ত কবি গান শুরু করেন। তাঁর গুরুর নাম মনোহর সরকার। বিজয় সরকারের সঙ্গে বহুদিন একত্রে গান করার ফলে নিশি এবং বিজয় নাম দুটি এ অঞ্চলে একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়। ১৯৫৮ সালের দিকে তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন। বৃদ্ধ এই কবিয়াল এখনো নকুল দত্ত, সুরেন সরকার, রসিক সরকার প্রমুখের সঙ্গে গান করেন।

৪৩ কবিয়াল কামিনী সরকারের জন্ম গত শতাব্দীর শেষ দিকে খুলনার চিতলমারির কাছে কুড়ালতলা গ্রামে। বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইনি কবিগানে খুব নাম করেছিলেন। তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাব সম্পর্কে কিছু গল্প ঐ অঞ্চলে এখনো প্রচলিত আছে।

৪৫ স্বরূপেন্দু সরকার বা স্বরূপ সরকার খুলনা জেলার চিতলমারি থানার অন্তর্গত চরবানিয়ারি গ্রামে ১৯৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর গুরুর নাম নিশিকান্ত সরকার। গুরুর মতোই ইনি "আলোচনা" অংশে অধিক দক্ষ। স্বরূপেন্দু সরকারের সমাজসংস্কারমূলক মানসিকতা বেশ প্রবল। কবিগানের আসরে এবং বাইরে সর্বত্র, সমাজের নোংরামি এবং ধর্মের ভণ্ডামিকে তিনি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেন।

৪৫ ধুয়াগানের জনপ্রিয়তায় বিজয় সরকারের পরেই রসিক সরকারের নাম উল্লেখযোগ্য। এমন কি, কোনো কোনো গানে তিনি তাঁর গুরু

বিজয় সরকারের চেয়েও অধিক কৃতিত্ব দেখাতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর কিছু গানে আধুনিক লঘু সঙ্গীতের সুরের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৯ সালে খুলনা জেলার রামপাল থানার অন্তর্গত ভাগা গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে রসিক সরকার প্রতিবেশী রামায়ণ-গায়ক রাজেন মালোর দলে হারমোনিয়ম বাজাতেন। রাজেন মালোও পরবর্তীকালে কবিয়াল হয়েছিলেন। রসিক সরকার বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নিউ বারাকপুরে থাকেন।

৪৬ রাজেন্দ্রনাথ সরকারের ভ্রাতুষ্পুত্র অনাদিজ্ঞান সরকার সংক্ষেপে অনাদি সরকার নামে পরিচিত। ১৯২৮ সালে খুলনা জেলার মোল্লাহাট থানার অন্তর্গত মেহেরপুর গ্রামে মাতুলালয়ে অনাদিজ্ঞান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা নিকুঞ্জবিহারী ওড়াকান্দির মতুয়া সম্প্রদায়ভুক্ত একজন সাধুব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি বহু লোকগীতি রচনা করেন। অনাদি সরকারের গুরু, তাঁর 'জ্যাঠামশাই' রাজেন্দ্রনাথ সরকার। ১৯৫১ সালের দিকে অনাদিজ্ঞান সর্বপ্রথম কবির দল গঠন করে গান গাইতে শুরু করেন।

৪৭ প্রফুল্ল বিশ্বাসের জন্ম গত শতকের শেষ দিকে যশোরের কালিয়ায়। এ ধরনের গান রচনা করলেও তিনি নিজে কবিগান করতেন না। কোনো কোনো কবিয়াল তাঁর রচিত গান ব্যবহার করেন। ইনি ১৯৭১ সালে মারা যান।

৪৮ ১৯৩৪ খ্রীস্টাব্দে মোংলা বন্দরের নিকটবর্তী বুড়ির ডাঙ্গা গ্রামে দিগেন্দ্রনাথ সরকার (দিগেন সরকার) জন্মগ্রহণ করেন। এঁর পিতা হরিহর সরকার একজন কবিয়াল ছিলেন। কবিগান ছাড়া কীর্তন ও যাত্রাগানেও ইনি সমান দক্ষ।

৪৯ তারকচন্দ্র সরকার বা তারক সরকারের জন্ম ১৮৪৭ সালে যশোরের জয়পুর গ্রামে। তিনি মতুয়া সম্প্রদায়ের অন্যতম প্রচারক ছিলেন। কবিগান ছিলো তাঁর প্রচারের মাধ্যম। এঁর এই ধরনের কিছু গান ওড়াকান্দি-ফরিদপুর থেকে মুদ্রিত হয়েছে। ইনি ১৯১৫ সালে মারা যান।

৫০ খুলনা জেলায় মোল্লাহাট থানার অন্তর্গত গঙ্গাচর্ণা গ্রামে এক দরিদ্র পরিবারে অশ্বিনী সরকারের জন্ম হয়। এঁর জন্মসাল ১৮৭৭ এবং মৃত্যু হয় ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে। অশ্বিনীর এক চক্ষু কানা ছিলো।

কবিগান গাইতে শুরু করার পূর্বে তিনি কোনো ধনী গৃহস্থের বাড়িতে গোরু-রাখার কাজ করতেন। শেষ দিকে ইনিও মতুয়া সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট প্রচারক হন।

৫১ মকুন্দ দাস বা অন্যান্য চারণ কবিগণ ব্রিটিশবিরোধী হলেও নমঃশূদ্র কবিয়ালগণের অধিকাংশ ব্রিটিশকে সমর্থন করতেন।

৫২ Sushil Kumar Dey, p. 274

৫৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৮

৫৪ উনিশ শতকের শেষ দিকে বরিশালের ঝালকাঠির কোনো গ্রামে নকুল দত্ত জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কায়স্থ বংশোদ্ভূত ছিলেন। বিশ শতকের গোড়ার দিকে পূর্ববঙ্গের প্রখ্যাত কবিয়ালদের মধ্যে এঁর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দেশ বিভক্ত হওয়ার কিছুকালের মধ্যেই তিনি পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় নেন।

৫৫ ছোটো রাজেন ও কালিদাস সরকার আপন দুই ভাই। এঁদের জন্ম যথাক্রমে ১৯২৩ এবং ১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়া থানায়। কালিদাস বর্তমানে বাংলাদেশে থাকলেও ছোটো রাজেন পশ্চিমবঙ্গে কবিগান করেন। বিনয় সরকারের জন্মস্থান ফরিদপুরের সাতপাড় নামক গ্রামে। ১৯৩৫-৩৬ সালের দিকে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। এঁর ধুয়াগানে আধুনিক গানের সুরের অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। রবি সরকারের বাড়ি বরিশালের সাতলা নামক গ্রাম। ইনিও বিনয় বা কালিদাসের সমসাময়িক।

৫৬ নন্দলাল সরকার বা নন্দ সরকার ১৯০৩ সালে বরিশাল জেলার নাজিরপুর থানার অন্তর্গত লরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এঁর গুরু ছিলেন ঢাকার হরি আচার্য। সিদ্ধেশ্বর সরকারের বাড়ি বরিশালের মঠবাড়িয়া।

৫৭ কবিয়াল শ্রীবিজয়কৃষ্ণ অধিকারী, 'কেশব ভুঁইয়ার কবি'।

৫৮ 'কেশব ভুঁইয়ার কবি'র জবাব। কবিয়াল নিশিকান্ত, ছোটো রাজেন, স্বরূপেন্দু প্রমুখের প্রদত্ত জবাব থেকে পুনর্গঠিত।

৫৯ যমুনা অংশে উদ্ধৃত এবং নিবন্ধ অংশে ব্যবহৃত সমস্ত গানই লেখকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সংগৃহীত।